সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ডিসেম্বর ২০১৫

আরাকু ভ্যালির পথে...

উপরের পাঁচটি ছবি:
১৮-১৯ নভেম্বর ২০১৫ ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর

নিচের তিনটি ছবি:
ক. ২ ডিসেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার পঙ্কজ সরনের বিদায়ী সাক্ষাৎ
খ. ১ ডিসেম্বর ২০১৫ বিবিআইএন-এফ মটর শোভাযাত্রায় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে মাননীয় পঙ্কজ সরন
গ. ৭ ডিসেম্বর ২০১৫ বাংলাদেশ ভারত ফাউন্ডেশনের পরিচালকমণ্ডলীর তৃতীয় বৈঠকে মাননীয় পঙ্কজ সরন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

বর্ষ তেতাল্লিশ | সংখ্যা ১১ | অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২২ | ডিসেম্বর ২০১৫

শত তরুণের ভারত-দর্শন

আরাকু ভ্যালির পথে...

সূচিপত্র

ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানী ॥ তপন চক্রবর্তী ০৪ ◆ শুভ্রা মুখোপাধ্যায়: প্রয়াণলেখ ॥ মলয়মদন মুখোপাধ্যায় ০৭ ◆ শত তরুণের ভারত-দর্শন ॥ এস এম মুন্না ১০ ◆ ছোটগল্প ॥ জন্মদিনে ॥ কৌস্তভ বসু ১৪ ◆ ক্রনিকাল অফ আ কর্পস বিয়ারার ॥ হোসেনউদ্দিন হোসেন ১৬ ◆ ছোটগল্প ॥ নাকছাবি ॥ কাজী লাবণ্য ২০ ◆ কবিতা ॥ হাসান হাবিব ॥ জহিরুল মামুন ॥ শেলী সেনগুপ্তা ॥ নীহার মোশারফ ২৪ ॥ অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায় ॥ জুনান নাশিত ॥ জাফরুল আহসান ॥ শিহাব শাহরিয়ার ২৫ ◆ বিগফুট কি সত্যিই আছে? ॥ নাসরীন মুস্তাফা ২৬ ◆ অনুবাদ গল্প ॥ গোয়ালিনী ॥ মাস্তি ভেঙ্কটেশ আয়াঙ্গার ৩০ ◆ সৌহার্দ ॥ ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৩৬ ◆ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥ রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা ॥ সালেহা চৌধুরী ৩৭ ◆ নরেন্দ্রনাথের গল্প ॥ অমর মিত্র ৪৩ ◆ আরাকু ভ্যালির পথে... ॥ ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ৪৬ ◆ শেষ পাতা ॥ সলিল চৌধুরী ॥ এমিলি জামান ৪৮ ◆

০৭

শুভ্রা মুখোপাধ্যায়: প্রয়াণলেখ

গত ১৮ই অগাস্ট ২০১৫-য় প্রয়াত হলেন ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী, ভারতের ফার্স্ট লেডি শ্রদ্ধেয়া শুভ্রা মুখোপাধ্যায়। তাঁর নিজস্ব পরিচয়ে শুভ্রা দেবী ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী ও লেখক। ৭৫ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ ছিন্ন করে দিল প্রণববাবুর সঙ্গে তাঁর সাতান্ন বছরেরও বেশি সময়ের দাম্পত্য সম্পর্ক। মাতৃহারা হলেন শুভ্রাদেবীর দুই পুত্র এবং এক কন্যা।

বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর জীবনেতিহাস মরমী হয়ে জড়িয়ে আছে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষে জোরদার জনমত গঠন করে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সে-সময়কার ভারতের রাজ্যসভার সদস্য প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল খুবই সার্থক।

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মোঃ রেদওয়ানুর রহমান

মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১/৫১এ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৬২১৯৮

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

অনন্ত কামনা

ভালবাসতে পারিনি তুমি বলে গেছ
রক্ত কণিকায় আগুন জ্বলছে তাই
তবুও তুমি মনে ও কবিতায় আছ
বিপ্লবী মনে যে তোমার তুলনা নাই।
চিৎকারে খুব বলতে ইচ্ছে করে
ত্রাস-সন্ত্রাস রোধিব মনে-প্রাণে
ভালবাসার বাণী-কথা শুনিব পরে
লজ্জা-শরমের দাদ-প্রতিশোধ নিয়ে।
বাসর সাজাব স্বাধীনতা কামনায়
সারা দুনিয়া জানবে এই ইতিহাস
রক্তে আগুন জ্বলবে শত্রুর বাসনায়
কাব্যে কাব্যে ধ্বনিত হবে দীর্ঘশ্বাস।
গগনে গর্জিবে মানুষের জয়গান
জগত জানবে মহাপ্রভূর দান।

মুকুল কেশরী
কেশরহাট, রাজশাহী

ভক্ত পাঠক

আমরা *ভারত বিচিত্রা*র ভক্ত পাঠক। ভারত-বর্ষকে জানতে এবং এর সনাতন ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির পরপূর্ণ জ্ঞানলাভে পত্রিকাটির তুলনা নেই। ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার পোড়াকান্দুলীয়া গ্রামে শত বছরের প্রাচীন শ্রীশ্রী শ্মশানকালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত। আমরা এই মন্দিরের সেবক। আমরা মাঝে মধ্যে *ভারত বিচিত্রা* সংগ্রহ করে পাঠ করি। কিন্তু গ্রাহক না হওয়ায় সকল প্রকাশনা নিয়মিত পড়তে পারি না বলে সবসময়ই আপশোষ ও দুঃখবোধ করি। সম্প্রতি *ভারত বিচিত্রা*র আগস্ট ২০১৫ সংখ্যায় নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তির বিজ্ঞাপন দেখে নতুন গ্রাহক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্দেশে নিম্নে নাম-ঠিকানা উল্লেখ করলাম। ভারতের তীর্থস্থানগুলোর মাহাত্ম্য ধারাবাহিকভাবে *ভারত বিচিত্রা*য় প্রকাশ করলে আমরা বাধিত হব।

উপেন্দ্র সাহা সভাপতি
শ্রীশ্রী শ্মশানকালী মন্দির
পোড়া কান্দুলীয়া বাজার, ডাকঘর- পোড়া কান্দুলীয়া
ময়মনসিংহ-২৪১০

উন্নত মানসম্পন্ন

অমি একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি। আমার স্বামী বাংলাদেশ ডাক বিভাগে চাকরি করেন। আমাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। আমি শিক্ষকতার পাশাপাশি সাংসারিক কাজকর্ম সম্পাদন, সন্তানের লেখাপড়া পর্যবেক্ষণ এবং অবসরে প্রখ্যাত লেখক-লেখিকার রচনাসমৃদ্ধ বই পত্র-পত্রিকা নিয়মিত পাঠ করি। এতে আমার একদিকে জ্ঞানানুশীলন হয়, অন্যদিকে আমি বিমল আনন্দ লাভ করি। আমি জানতে পেলাম আপনাদের দূতাবাস থেকে *ভারত বিচিত্রা* নামে একটি উন্নত মানসম্পন্ন মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং আগ্রহী পাঠক-পাঠিকাদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। আমি পত্রিকাটি পড়তে ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় আমার ঠিকানায় নিয়মিতভাবে *ভারত বিচিত্রা* প্রেরণের অনুরোধ জানাচ্ছি।

তাপসী রানী দাস
প্রযত্নে- পঙ্কজ কুমার সরকার
গ্রাম + ডাকঘর- গুহ লক্ষীপুর
ফরিদপুর-৭৮০০

সংযুক্ত থাকতে চাই

আমি ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন প্রকাশিত মাসিক *ভারত বিচিত্রা* পড়তে ইচ্ছুক। পত্রিকাটি গবেষণামূলক হওয়ায় তা পড়ে আমি ভারতের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথ্য, সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞানলাভ করতে পারি। তাছাড়া, ভারতের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনেক বিষয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের মিল থাকায় তা অধিকতরভাবে জানা ও বোঝার জন্য *ভারত বিচিত্রা*র সাথে সব সময় সংযুক্ত থাকতে চাই। তাই নতুন গ্রাহক হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে প্রার্থিত তথ্যাদি নীচে উল্লেখ করলাম। আমাকে *ভারত বিচিত্রা*র সঙ্গে সব সময় সংযুক্ত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

কাজী নেয়ামুল শাহীন অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
সরকারি খুলনা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
খালিশপুর খুলনা-৯০০০

অতি উচ্চমানের

আমাদের ঈদুল আজহা, আপনাদের শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অপূর্ব মিলন কেন্দ্র বাংলাদেশ। সামনের দিনে আমাদের এ দেশ আরো শান্তিময় হোক, মঙ্গলময় হোক, সুখী ও সমৃদ্ধশালী হোক কামনা করি। *ভারত বিচিত্রা*র আমি একজন নিয়মিত পাঠক। আপনাকে এই অতি উচ্চমানের পত্রিকাটি সম্পাদনের দায়িত্ব পালনের জন্য অভিনন্দন জানাই।

বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকার জগতে *ভারত বিচিত্রা* এক অতি সুপরিচিত নাম। এর যশ ও খ্যাতি অব্যাহত থাকুক, পাঠক সমাজে আরো সমাদৃত হোক কামনা করি। আপনার শুভানুধ্যায়ী কবি মুজাহিদী আমাকে বলছিলেন ভারতের সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামকে নিয়ে লেখা আমার ছোট্ট নিবন্ধটি আপনার ভারত বিচিত্রায় পাঠাতে। আপনি জায়গা করে দেওয়ায় আমি কৃতজ্ঞ।

লে. জেনারেল মাহবুবুর রহমান (অব.)
সাবেক সেনাপ্রধান
বাড়ি-৫২, সড়ক-২, বনানী ডিওএইচএস
বনানী, ঢাকা-১২০৬

নিয়মিত পেতে চাই

সৌহার্দ্য সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা*র একজন নিয়মিত গ্রাহক হিসেবে বহুদিন যাবৎ পত্রিকাটি পেয়ে থাকি। আমার সদস্য সংখ্যা ৬৫৯১। *ভারত বিচিত্রা*র মাধ্যমে দু'বাংলার ধর্ম-বর্ণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে পারি। আজ দু'বাংলার ছিটমহল বিনিময় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ৬৮ বছর পর ছিটমহলবাসী পেল তাদের নাগরিক অধিকার। তাই এ ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণে দু'বাংলার ছিটমহলবাসীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। আমি একজন ব্যাংকার। কর্মের তাগিদে রাজশাহীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছি বিধায় পূর্বের ঠিকানার পরিবর্তে বর্তমান ঠিকানায় *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত পেতে চাই।

এম এ লতিফ
প্রযত্নে- এম এন ইসলাম
১৭৬/১, পবা নতুন পাড়া, ডাকঘর- সপুরা
রাজশাহী-৬২০৩

আত্মজা ও তাদের মায়ের কলকাকলিতে ঘুম ভেঙে গেলে বাইরে তাকিয়ে দেখি তখনও সুষুপ্তির ঘোর কাটেনি প্রকৃতির – শান্ত, স্তব্ধ, ধ্যানমগ্ন চরাচর কুয়াশার চাদরে মোড়া। কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব দিগন্তে দেখা মিলল জবাকুসুম শঙ্কাশং সূর্যের– অন্ধকারের দুয়ার ভেঙে সেই জ্যোর্তিময়ের আবির্ভাবে ধীরে ধীরে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল চেতনা। মনে পড়ল, এমনি শীতের দিনে ১৯৭১ সালের মধ্যডিসেম্বরে বাংলাদেশেও নতুন সূর্যোদয় হয়েছিল, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী লড়াই-সংগ্রামের পর সেদিন লাল-সবুজের পতাকা উড়েছিল বাংলার আকাশে। সেদিন ভারতীয় মিত্রবাহিনি বাংলার মুক্তিসেনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন এবং হানাদার পাকবাহিনিকে পরাস্ত ও আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর রমনার রেসকোর্স ময়দানে সেই আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন লে. জেনারেল নিয়াজি।

ডিসেম্বরের যুদ্ধশেষের একখণ্ড চিত্রনাট্য তুলে ধরছি আজকের তরুণ প্রজন্মের জন্য যাঁরা শুধু মুক্তিযুদ্ধের গল্পই এতকাল শুনেছেন:

> রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছে পাকিস্তানিরা। ভোরের সূর্য উঠতে না উঠতে কুয়াশার পর্দা ঠেলে ওরা ছুটে এসেছে পরিত্যাক্ত আর্মি ক্যাম্পে। চারদিকে মুহুর্মুহু জয়বাংলা স্লোগান। একটা হল ঘরের দরজা ভেঙে বের করে আনে অর্ধমৃত বন্দীদের। তারাই দেখিয়ে দেয় সায়েন্স বিল্ডিঙের ওপাশেই নারী নির্যাতন কেন্দ্র। সেখানকার বন্ধ দরজা ভাঙা হয়। তবু কেউ বেরোয় না। ঘরের মধ্যে অন্ধকার দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল তুলে। বাইরে থেকে মিত্রবাহিনির অফিসার হেঁকে ওঠেন– 'কোঈ হ্যায়? ইধার আও।' কেউ সাড়া দেয় না। মুক্তিযোদ্ধারা বাংলা ভাষায় আহ্বান জানায়– 'মা-বোনেরা কেউ ভেতরে থাকলে বাইরে চলে এস। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আর ভয় নেই। জয়বাংলা।'
>
> এই আহ্বানে একটি বিবস্ত্র মেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। সহসা দিনের আলোয় নিজেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ বিবস্ত্র দেখে সে ফিরে যেতে উদ্যত হয়। কিন্তু মিত্রবাহিনির অফিসার যোগীন্দর সিং নিজের শরীর দিয়ে তাকে আড়াল করে এবং ক্ষিপ্রহাতে নিজের মাথার পাগড়ি খুলে তার শরীর ঢেকে দেয়। শিখ সৈনিকটির বুকে মুখ ঢেকে মেয়েটি হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। বিদেশী সৈনিকটি তার মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়, 'রোনা মাৎ মাঈ'।

সেদিনের সেই ভারতীয় অফিসারের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। সেদিন তিনি আমাদের গোটা জাতির গায়ে আব্রু তুলে গিয়েছিলেন। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর *জোছনা ও জননী* উপন্যাসে লিখেছেন, 'ভারতীয় বাহিনীর কার্যক্রম ছোট করে দেখানোর একটি প্রবণতাও আমাদের আছে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর কেউ যদি বাংলাদেশে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস ও ছোটগল্প পড়ে যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা করতে চায়, তাহলে তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিষয়ে কিছুই জানবে না। আমাদের গল্প-উপন্যাসে বিদেশী সৈন্যবাহিনীর বিষয় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। লেখকরা হয়তো ভেবেছেন এতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের গৌরবের হানি হবে। ঋণ স্বীকারে অগৌরবের কিছু নেই। মহান জাতি এবং মহান মানুষরাই ঋণ স্বীকার করেন। আমি আমার বইটিতে আমাদের দেশের স্বাধীনতার জন্যে যে-সব ভারতীয় সৈন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের একটি তালিকা দিতে চেয়েছিলাম, যাতে পাঠকরা এই দীর্ঘ তালিকা পড়ে একবার শুধু বলেন, আহারে!'

আজকের কুয়াশাভেজা সকাল যেন সেই সকালের অভিজ্ঞান হয়ে দেখা দিল।

কাদম্বিনী গাঙ্গুলি

আনন্দীবাঈ জোশী

জানকি আম্মাল

প্রবন্ধ

ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানী

তপন চক্রবর্তী

একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর নাম বলতে বললে প্রথমে যে কেউ সম্ভবত একজন পুরুষ পদার্থ, রসায়ন কিংবা জীববিজ্ঞানীর নাম বলবেন। চট করে কারো মনে ভারতীয় কোন মহিলা বিজ্ঞানীর নাম মনে পড়বে না। কারণ, ব্রিটিশ রাজত্বের সময় থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে মহিলা বিজ্ঞানীর সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। সম্প্রতি বিজ্ঞান গবেষণায় নারীর অংশগ্রহণ একটু বাড়লেও তা খুব সন্তোষজনক নয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও পিছিয়ে থাকা অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় অংশগ্রহণ আরো কম। বাস্তবে,ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠাগুলোতে রোল মডেল হিসাবে মহিলা বিজ্ঞানীর সংখ্যা হাতেগোনা।

বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত নারীদের চাকরি বা গবেষণায় নিবেদিত হতে বিস্তর প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। পূর্বে গোঁড়া সমাজের অনুশাসন অমান্য করে মেয়েরা শিক্ষাগ্রহণ করলেও তা ছিল মূলত শিল্পকলাভিত্তিক– বিজ্ঞান শিক্ষায় ঘোরতর আপত্তি ছিল। যে সব শিক্ষার্থীর উদার বাবা, স্বামী বা আপনজনেরা সুশিক্ষিত– তাঁরা বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণে কিছুটা সহায়তা পেতেন। আজ থেকে দেড়শো বছর আগে পুরুষরাও উচ্চশিক্ষা লাভে বিদেশে গেলে সমাজচ্যুত হতেন। তখন মহিলাদের বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রশ্নই আসে না। নিকট-আত্মীয়দের কেউ বিপুল বিত্তবান হলে বা আপনজনদের কেউ সরকারি ক্ষমতার অধিকারী হলে তাঁদের আনুকূল্যে পুরুষ শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিজ্ঞানে বা অন্য বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশের বাইরে যাওয়া হয়তো সম্ভব হত। অন্যথায় পারিবারিক অন্ধত্ব ও সামাজিক গোঁড়ামি ডিঙিয়ে কারো পক্ষে এরকম দুঃসাহস দেখানো সম্ভব হত না।

সাম্প্রতিককালেও একজন বিজ্ঞানের মহিলা শিক্ষক বা গবেষককে সংসারের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে ঢিমেতালে এগোতে হয়। বিশেষ করে সন্তান ধারণ করা বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে সমস্যা আরো বেশি। তাঁরা চাকরি বা গবেষণায় দীর্ঘ সময় দিতে পারেন না। একুশ শতকেও একজন মহিলা বিজ্ঞানকর্মী বা গবেষক পুরুষের মত মুক্তভাবে কাজ করতে পারেন না।

এতসব দুস্তর বাধা জয় করে যে, সব সংগ্রামী মহিলা ভারতীয় বিজ্ঞানে মহৎ অবদান রেখেছেন এবং অন্যদের কাছে প্রেরণার উৎস এবং আদর্শরূপে গণ্য হয়েছেন তাঁদের সংখ্যা হাতেগোনা। এঁদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিচে পরিবেশন করা হচ্ছে।

কাদম্বিনী গাঙ্গুলি

(১৮ জুলাই ১৮৬১-৩ অক্টোবর ১৯২৩)

কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ও চন্দ্রমুখী বসু সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা। দক্ষিণ এশিয়ায় কাদম্বিনী ও আনন্দী যোশী পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিদ্যার প্রথম স্নাতক। উভয়ে একই বছরে (১৮৮৬) চিকিৎসাবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

কাদম্বিনী গাঙ্গুলি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ ভারতের বিহারের ভাগলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ব্রজকিশোর বসু। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত একজন সমাজ সংস্কারক। তাঁদের পৈতৃক ভিটে ছিল বাংলাদেশের বরিশাল জেলার চাঁদসিতে। ব্রজকিশোর ভাগলপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ভাগলপুরের নারীমুক্তির লক্ষ্যে ১৮৬৩ সালে তিনি–অভয়চরণ মল্লিকের সহযোগিতায় ভাগলপুর মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ভারতের প্রথম নারী সংগঠন।

কাদম্বিনী প্রথমে বাংলা মহিলা বিদ্যালয় ও পরে বেথুন (কানাডার মানবতাবাদী ও বিদ্যোৎসাহী বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক হেনরি নরম্যান বেথুন প্রতিষ্ঠিত)) স্কুল থেকে ১৮৭৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম মহিলা পরীক্ষার্থী হিসেবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কাদম্বিনীরই চেষ্টায় স্কুলে এফএ (ফার্স্টস আর্টস) এবং ১৮৮৩ সালে স্নাতক ক্লাসের পত্তন ঘটে। তিনি ও চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজের প্রথম স্নাতক পাশ ছাত্রী। তাঁরা সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও প্রথম স্নাতক-উত্তীর্ণ মহিলা।

কাদম্বিনী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৬ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ও আনন্দী জোশী প্রথম ভারতের পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যায় শিক্ষিত মহিলা চিকিৎসক। কাদম্বিনীকে কিছুসংখ্যক গোঁড়া চিকিৎসক সহকর্মী ও সমাজের একাংশের বিরোধিতা মোকাবিলা করতে হয়। তিনি ১৮৯২ সালে যুক্তরাজ্যে গমন করেন এবং এডিনবরা থেকে এলআরসিপি, গ্লাসগো থেকে এলআরসিএস ও ডাবলিন থেকে জিএফপিএস ডিগ্রি লাভ করে ভারতে ফিরে আসেন। উল্লেখ্য যে, ১৮৮৯ সালের আগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তি করা হত না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ১৮৮৮ সালের আগে ছাত্রী ভর্তির অনুমোদন দেয়নি। স্বল্পসময়ের জন্য লেডি ডুফেনির হাসপাতালে কাজ করার পর কাদম্বিনী প্রাইভেটে রোগী দেখা শুরু করেন।

ব্রাহ্ম সমাজসংস্কারক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি আট সন্তানের মা হন। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে গৃহকর্ম ও চিকিৎসাসেবা একসঙ্গে সুষ্ঠুভাবে করে গেছেন। সেই সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ আন্দোলনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। ভারতে নারীমুক্তির লক্ষ্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

আনন্দীবাঈ জোশী

(৩১ মার্চ ১৮৬৫ - ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭)

ডা. আনন্দীবাঈ জোশীর পরমায়ু ছিল অতি ক্ষীণ। ক্ষণজীবী এই নারীর জীবন দুর্বিসহ দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়। ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলির মত তিনিও ছিলেন সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসক।

বালিকা জোশীর পৈতৃক নাম ছিল যমুনা। তিনি মহারাষ্ট্রের থানে জেলার কল্যাণে এক মারাঠি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জোশী পরিবার ছিল কল্যাণের জমিদার। কোন কারণে পরিবারটি অর্থ ও লোকবল হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। যমুনাকে মাত্র ৯ বছর বয়সে বিপত্নীক ২৯ বছর বয়স্ক গোপাল রাওয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। গোপাল রাও তাঁর নাম যমুনার পরিবর্তে আনন্দীবাঈ গোপাল রাও জোশী রাখেন।

গোপাল রাও কল্যাণে ডাকঘরের করণিকের কাজ করতেন। পরে তিনি আলিবাগে বদলি হন। অবশেষে তাঁকে কলকাতায় পাঠানো হয়। গোপাল রাও জোশী প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী এবং তিনি নারীশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। এই সময়ে ভারতে নারীশিক্ষার ব্যাপারে প্রায় সবাই উদাসীন ছিলেন। তখন ভারতে ব্রাহ্মণ পরিবারের পুরুষরা সংস্কৃতবিদ্যায় কৃতবিদ্য হওয়ার চেষ্টা করতেন। গোপাল রাও সংস্কৃতের পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন। আনন্দীর পড়াশোনায় আগ্রহ দেখে গোপাল রাও তাঁকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় পারদর্শী করে তোলেন।

আনন্দী ১৪ বছর বয়সে এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। শিশুটি ১০ দিন পর মারা যায়। পর্যাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম ও দক্ষ চিকিৎসকের অভাবে সন্তানের মৃত্যুই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আনন্দীবাঈ চিকিৎসক হওয়ার সংকল্প করেন।

গোপাল রাও জোশীও তাঁর স্ত্রীকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে উৎসাহিত করেন। গোপাল রাও ১৮৮০ সালে আমেরিকার বিখ্যাত মিশনারি রয়্যাল ওয়াইল্ডারকে আমেরিকায় আনন্দীবাঈয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহের কথা জানিয়ে পত্র লেখেন এবং নিজের জন্যও তাঁর যোগ্য পদে একটি চাকরির খোঁজ করার অনুরোধ জানান। জোশীদম্পতি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হলে ওয়াইল্ডার তাঁদের সাহায্য করতে সম্মত বলে জানান। স্বামী-স্ত্রী ওয়াইল্ডারের প্রস্তাবে রাজি হননি।

ওয়াইল্ডার *প্রিন্সটন'স মিশনারি রিভিউ*-তে গোপাল রাওয়ের সঙ্গে পত্রালাপের বিষয়টি প্রকাশ করেন। নিউজার্সি রাজ্যের রোজেলির বাসিন্দা থিওডিসিয়া কার্পেন্টার দন্ত চিকিৎসকের অপেক্ষায় চিকিৎসকের চেম্বারে বসেছিলেন। সেখানে টেবিলের উপর রাখা *মিশনারি রিভিউ*পত্রিকায় আনন্দীবাঈয়ের চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সংকল্পের কথা জানতে পারেন। থিওডিসিয়া গোপাল রাও ও আনন্দীবাঈকে আমেরিকায় তাঁর আতিথ্য গ্রহণের সাদর আমন্ত্রণ জানান। যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে থিওডিসিয়া ও আনন্দীবাঈয়ের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মসংক্রান্ত বহু চিঠি আদান-প্রদান হয়।

কলকাতা থাকার সময় আনন্দীবাঈয়ের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। তিনি দুর্বলতা, অবিরাম মাথাধরা, মাঝে মাঝে জ্বর ও শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। থিওডিসিয়া আমেরিকা থেকে ওষুধ পাঠাতে থাকেন। তাতেও অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল না। ১৮৮৩ সালে গোপাল রাওকে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার শ্রীরামপুরে বদলি করা হয়। গোপাল রাও আনন্দীবাঈয়ের দুর্বল স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তাঁকে চিকিৎসাশাস্ত্র পড়ার জন্য আমেরিকা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। গোপাল রাও আনন্দীকে মহিলারাও যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সক্ষম তার উদাহরণ সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়ে তাঁকে রাজি করান।

গোঁড়া হিন্দু সমাজ তাঁর আমেরিকা গমনে তিরস্কার করে। বহু খ্রিস্টান তাঁদের সমর্থন জানান, কিন্তু তাঁরা চান যে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রিস্টান হোন। আনন্দীবাঈ আমেরিকা যাওয়ার আগে শ্রীরামপুর কলেজের হলে এক সভার আয়োজন করেন। তিনি আমেকিায় গিয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি অর্জনের আগ্রহের কথা জানান। তিনি এও জানান যে, এই সিদ্ধান্তের জন্য তাঁদের অনেক লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে। তিনি ভারতে নারী চিকিৎসকের আবশ্যকতার ওপর জোর দেন এবং ভারতে মহিলাদের জন্য একটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করেন। তিনি খ্রিস্টান হবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেন। আনন্দীবাঈয়ের বক্তব্য শুনে জনগণ তাঁর ইচ্ছাকে সম্মান জানান এবং তাঁকে উদারহস্তে অর্থদানে এগিয়ে আসেন। ভারতের ভাইসরয়ও সরকারি শিক্ষা তহবিল থেকে তাঁকে ২০০ রুপি প্রদান করেন।

আনন্দীবাঈ কলকাতা থেকে জাহাজে আমেরিকা যাত্রা করেন। থি ওডিসিয়ার পরিচিত দুইজন ইংরেজ মহিলা তাঁকে সঙ্গ দেন। থিওডিসিয়া আনন্দীবাঈকে ১৮৮৩ সালের জুন মাসে আমেরিকায় অভ্যর্থনা জানান। তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা যিনি আমেরিকায় পা রাখেন। থরবর্ন নামের চিকিৎসকদম্পতি আনন্দীবাঈকে *উইমেনস মেডিক্যাল কলেজ অফ পেনসিলভ্যানিয়ায়* আবেদন করার পরামর্শ দেন। মহিলা কলেজে ভর্তির

আবেদন জানালে তা অনুমোদিত হয়। কলেজের ডীন রাচেল বোডলে তাঁকে ভর্তি করেন।

আনন্দীবাঈ ১৯ বছর বয়সে কলেজে ভর্তি হন। শীতল আবহাওয়া ও অনভ্যস্থ আহারে তাঁর শরীর আরো খারাপ হয়। ইতোমধ্যে তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন। শারীরিক বাধা সত্ত্বেও তিনি ১৮৮৬ সালের ১১ মার্চ এমডি ডিগ্রি অর্জন করেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভের সংবাদ পেয়ে রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করেন।

আনন্দীবাঈ ১৮৮৬ সালেই ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতবাসী তাঁকে বীরের সংবর্ধনা জানায়। রাজকীয় কোলহাপুর স্টেট তাঁকে এডওয়ার্ড হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ডের প্রধান হিসেবে নিয়োগদান করেন। আনন্দীবাঈ ১৮৮৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি মাত্র ২২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু সারা ভারতকে শোকগ্রস্ত করে। থিওডিসিয়া তাঁর চিতাভস্ম আমেরিকায় নিউইয়র্কের পওগকিপসি-র বাড়িতে নিয়ে যান।

জানকি আম্মাল এডাভ্যাল্যাথ কক্কট

(১৮৯৭-১৯৮৪)

আগেই বলেছি ভারতের অধিকাংশ মহিলা শিক্ষার্থীকে সাধারণত কলাবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। মাত্র গুটিকয় ছাত্রী বিজ্ঞান শিক্ষায় আসতেন। জানকি আম্মাল উদ্ভিদবিজ্ঞান পড়েন এবং পরে সাইটোজেনেটিকস (কোষ বংশগতিবিদ্যা) ও ফাইটোজিওগ্র্যাফি (উদ্ভিদভূগোল) বিষয়ে গবেষণা করেন।

জানকি আম্মাল ১৮৯৭ সালে ভারতের কেরালা রাজ্যের তেলিচেরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা দেওয়ান বাহাদুর এডাভ্যাল্যাথ কক্কট কৃষ্ণাণ মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) প্রেসিডেন্সির সাব-জজ পদে চাকরি করতেন। তাঁর ছয় ভাই ও পাঁচ বোন ছিল। তাঁর পরিবার মেয়েদেরকে শিল্পকলায় ব্যুৎপত্তিলাভে উৎসাহিত করত। কিন্তু আম্মাল উদ্ভিদবিজ্ঞান অধ্যয়নে ব্রতী হন। তেলিচেরিতে স্কুলজীবন শেষ করে তিনি মাদ্রাজ কুইন ম্যারি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে উদ্ভিদবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষকবৃন্দ তাঁকে সাইটোজেনেটিকস (কোষবংশগতিবিদ্যা) পড়ার জন্য প্রভাবিত করেন।

জানকি আম্মাল বারবোর স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকার *মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে* যাওয়ার আগে মাদ্রাজের *ওম্যান'স ক্রিশ্চিয়ান কলেজে* স্বল্পকালের জন্য শিক্ষকতা করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৫ সালে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ভারতে ফিরে এসে আম্মাল আবার ওম্যান'স ক্রিশ্চিয়ান কলেজে অধ্যাপনায় যোগ দেন। কিন্তু তাঁকে প্রথম *প্রাচ্য বারবোর ফেলো* হিসাবে পুনর্বার *মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে* পাঠানো হয় এবং তিনি ১৯৩১ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। আমেরিকায় পি এইচডি অর্জনকারী প্রথম ভারতীয় মহিলা জানকি আম্মাল দেশে ফিরে ত্রিবান্দ্রামের মহারাজার বিজ্ঞান কলেজে প্রফেসরের পদে যোগদান করেন। এই কলেজে ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। পরে ১৯৩৪-১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কয়েম্ব্যাটোরে *আখ উৎপাদন ইনস্টিটিউটে* বংশগতিবিদ বা জেনেটিসিস্ট পদে কাজ করেন।

তিনি ১৯৪০-৪৫ পর্যন্ত জন লন্ডনের *ইনস হর্টিকালচার ইনস্টিটিউশনে* সহকারী সাইটোলজিস্ট (কোষতত্ত্ববিদ) পদে এবং লন্ডনের উইসলে-তে অবস্থিত *রয়্যাল হর্টিকালচারাল সোসাইটিতেও* ১৯৪৫-৫১ সাল পর্যন্ত সাইটোলজিস্ট পদে গবেষণা করেন। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর আমন্ত্রণে তিনি ১৯৫১ সালে ভারতে ফিরে আসেন এবং *বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার* পুনর্গঠন করেন। তাঁকে ১৯৫২ সালের ১৪ অক্টোবর এই সংস্থার বিশেষ অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি পরে এর মহাপরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত হন।

ইনস্টিটিউট অফ সাইটোজেনেটিকস-এ জানকি আম্মালের কতিপয় আন্তঃগণের সংকর প্রজনন (intergenic hybrids) যথা, *Sacchrum* X *Zea*, *Sacchrum* X *Erianthus*, *Sacchrum* X *Imperata* ও *Sacchrum officinarum* (sugarcane) ও *Sacchrum* X *Sorghum* এবং আখ ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত ঘাস প্রজাতি ও গণ যেমন *Bambusa* (বাঁশ) সংক্রান্ত আন্তঃপ্রজাতি ও আন্তঃগণ গবেষণা যুগান্তকারী বলে স্বীকৃত।

এরপর জানকি আম্মাল ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও বিভিন্ন পদ যেমন এলাহাবাদের *সেন্ট্রাল বোটানিক্যাল ল্যাবোরেটরির* প্রধান, জম্মুর *রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবোরেটরির* বিশেষ কর্মকর্তা, ট্রম্বের *ভাবা এটমিক রিসার্চ সেন্টার*-এর স্বল্পকালীন গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে ১৯৭০ সালে তিনি ইউনিভারসিটি অফ মাদ্রাজের *সেন্টার ফর অ্যাডভ্যান্স সোসাইটির* এমেরিটাস সায়েন্টিস্ট পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রয়াণের পূর্বে জানকি আম্মাল মাদ্রাজের কাছে মদুরাভয়ালে *সেন্টার'স ফিল্ড ল্যাবোরেটরিতে* থাকতেন ও গবেষণা করতেন।

উপরোল্লেখিত গবেষণা ছাড়াও আম্মাল বিদেশে ও দেশে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। ১৯৩৯-১৯৫০ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডনে ছিলেন। এই সময় বাগানের বিভিন্ন উদ্ভিদের ক্রোমোজোম নিয়ে গবেষণা করেন। বহু উদ্ভিদে তাঁর ক্রোমোজোম সংখ্যা ও এর বিন্যাস গবেষণার ফলে অনেক প্রজাতি ও নানান উদ্ভিদের বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তিনি সি ডি ডারলিংটনের সঙ্গে যুগ্মভাবে *দ্য ক্রোমোজোম এটলাস অফ কালটিভেটেড প্ল্যান্টস* শীর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। এতে অনেক প্রজাতির উদ্ভিদের ওপর তাঁর গবেষণা সংকলিত হয়। আম্মাল ভেষজ ও অন্যান্য উদ্ভিদ ছাড়াও *Solanum*, *Dioscorea* , *Datura* , *Mentha* ও *Cymbopogon* গণভুক্ত উদ্ভিদের ওপর গবেষণা করেন। হিমালয়ের উত্তর-পূর্বের শীতল ও আর্দ্র আবহাওয়ার উদ্ভিদ প্রজাতি এবং উত্তর-পশ্চিমের হিমালয়ের শুষ্ক আবহাওয়ার উদ্ভিদের প্রজাতি শনাক্তকরণে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি বলেন, চিন ও মালয়ের উদ্ভিদের সঙ্গে ভারতীয় উদ্ভিদের সংকর পরাগায়ণ ঘটায় নানা ধরনের উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়েছে। অবসরকালে তিনি ভেষজ উদ্ভিদ ও অর্থকরী উদ্ভিদের ওপরও গবেষণা করেন। তিনি এসময় তাঁর গবেষণালব্ধ মৌলিক বিষয়সমূহ প্রকাশ করতে শুরু করেন। *সেন্টার অফ অ্যাডভ্যান্সড স্টাডি ফিল্ড ল্যাবোরেটরিতে* অবস্থানকালে তিনি ভেষজ উদ্ভিদের বাগান গড়ে তোলেন। এ ছাড়া তিনি সাইটোলজি (কোষতত্ত্ব) ও ইথনোবোটানি (উদ্ভিদের বিবর্তন) গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন।

উইসলেতে ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে *রয়্যাল হর্টিকালচারল সোসাইটির* বাগানে ড. জানকি আম্মাল বংশগতিবিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করার সময় ম্যাগনোলিয়াসহ কতিপয় দারুবৃক্ষের অঙ্কুরিত চারার ওপর কোলসিসাইন (একটি রসায়ন) প্রয়োগ করে দেখেন যে কচি পাতাগুলো দ্রুত পূর্ণবিকশিত হয়ে যায় এবং এতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। পরে এই বৃক্ষের পাতা পুরু হয়, বিভিন্ন রঙের ফুলের সমাবেশ ঘটে, ফুলের পাপড়ি পুরু হয় ও ফুল দীর্ঘদিন তাজা থাকে। ম্যাগনোলিয়া কোবাসের প্রচুর বীজ পাওয়া যায়। জানকি উইসলের ব্যাটলেস্টোন পাহাড়ে অনেকগুলো বীজ রোপণ করেন। তাঁর সম্মানে ম্যাগনোলিয়া বৃক্ষের ফুলের নাম *ম্যাগনোলিয়া কোবাস জানকি আম্মাল* রাখা হয়।

- ১৯৩৫ সালে জানকি আম্মালকে *ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সেস* এবং ১৯৫৭ সালে *ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স একাডেমির* **ফেলো** নির্বাচিত হন।
- ইউনিভারসিটি অফ মিশিগান ১৯৫৬ সালে তাঁকে সাম্মানিক **এলএল ডি (পি এইচডি-র সমকক্ষ)** উপাধিতে ভূষিত করে।
- ভারত সরকার ১৯৭৭ সালে তাঁকে *পদ্মশ্রী* উপাধিতে ভূষিত করেন।
- ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২০০০ সালে তাঁর নামে ট্যাক্সোনমিতে (শ্রেণিবিন্যাস তত্ত্ব) জাতীয় পুরস্কার ঘোষণা করে। পুরস্কারের নাম *জানকি আম্মাল ন্যাশন্যাল এওয়ার্ড ফর ট্যাক্সোনমি*।

• পরবর্তী সংখ্যায়

তপন চক্রবর্তী
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক ও চিকিৎসক

স্মরণ

শুভ্রা মুখোপাধ্যায়: প্রয়াণলেখ

মলয়মদন মুখোপাধ্যায়

গত ১৮ই আগস্ট ২০১৫-য় প্রয়াত হলেন ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী, ভারতের ফার্স্ট লেডি শ্রদ্ধেয়া শুভ্রা মুখোপাধ্যায়। তাঁর নিজস্ব পরিচয়ে শুভ্রাদেবী ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী ও লেখক। ৭৫ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ ছিন্ন করে দিল প্রণববাবুর সঙ্গে তাঁর সাতান্ন বছরেরও বেশি সময়ের দাম্পত্য সম্পর্ক। মাতৃহারা হলেন শুভ্রাদেবীর দুই পুত্র এবং এক কন্যা।

বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর জীবনেতিহাস মরমী হয়ে জড়িয়ে আছে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পক্ষে জোরদার জনমত গঠন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সে-সময়কার ভারতের রাজ্যসভার সদস্য প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা ছিল খুবই সার্থক। '৭১-এর ১৫ই জুন রাজ্যসভায় তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ভারতের। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের ফলশ্রুতিতেই সম্ভবত বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের অবস্থান স্থির হয়। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ইওরোপ-আমেরিকা সফর করেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বক্তৃতা দেন– সংসদেও এ-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় ভূমিকা নেন। রাঢ়বঙ্গের ভূমিপুত্র প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পেছনে যে ছিল তাঁর স্ত্রী শুভ্রাদেবীর সমর্থন, তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না আমাদের। শুভ্রার দেশ ছিল যে বাংলাদেশের যশোর জেলায়। বাঙালির অবমাননা তাই তাঁর বুকে বড্ড বেজেছিল।

শুভ্রার জন্ম যশোরের নড়াইলে, যে নড়াইল জন্ম দিয়েছে এস এম সুলতানের মত চিত্রশিল্পীকেও, যাঁর চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল পাবলো পিকাসোর সঙ্গেই, প্যারিসে। নড়াইলের সদর উপজেলার ভদ্রবিলা গ্রামে আজও তাঁর ভাইয়েরা বসবাস করেন।

শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় কেবল রাষ্ট্রপতিজায়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর স্বতন্ত্র পরিচয়ের সম্ভ্রান্ত ব্যাপ্তি রয়েছে। ছবি আঁকতেন চমৎকার। গানেও পারদর্শী ছিলেন– গঠন করেছিলেন 'গীতাঞ্জলি' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা, যে সংস্থার হয়ে তাঁর দল দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে। রবীন্দ্রনাথের একাধিক নৃত্যনাট্য তাঁর পরিচালনায় পরিবেশিত হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থকারও তিনি। লিখেছেন ছোটগল্পও।

শুভ্রাদেবীর মাতুলালয় কাছেই তুলারামপুরে, যেখানে চারবছর বয়সে গিয়ে তিনি চাঁচড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েন। ১৯৫০ সাল নাগাদ তিনি ভারতে চলে আসেন। তখন তাঁর বয়স দশ বছর। শুভ্রার সহোদর ভাই কানাইলাল ঘোষ অদ্যপি নড়াইলের বাসিন্দা। ২০১৩ সালে শুভ্রাদেবী তাঁর জন্মস্থান ঘুরে গেছেন স্বামী ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

অন্য অনুষঙ্গেও শুভ্রাদেবীর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। ১৯৭৫-এ যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে নিহত হলেন তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসভবনে, সে-সময় বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহানা জার্মানিতে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান। এরপর তাঁরা বেশ কয়েক বছর রাজনৈতিক আশ্রয়ে ভারতে বসবাস করেন। সেসময় তাঁরা দুই বোন বেশ কিছুকাল শুভ্রাদেবীর স্নেহচ্ছায়ায় তাঁর দিল্লিস্থ বাড়িতেই থাকতেন। সব প্রোটোকল ভেঙে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয়া শেখ হাসিনা তাই ঢাকা থেকে ১৩ তালকাটোরা রোডের বাড়িতে ছুটে গিয়ে শুভ্রাদেবীর প্রতি তাঁর অন্তিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন এবং যোগ দিয়েছেন ১৯ তারিখ সকালে অনুষ্ঠিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়। এসেছিলেন শেখ রেহানাও। এসেছিলেন বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আবদুল হামিদ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী।

শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় কেবল রাষ্ট্রপতিজায়াতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর স্বতন্ত্র পরিচয়ের সম্ভ্রান্ত ব্যাপ্তি রয়েছে। ছবি আঁকতেন চমৎকার। গানেও পারদর্শী ছিলেন– গঠন করেছিলেন 'গীতাঞ্জলি' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা, যে সংস্থার হয়ে তাঁর দল দেশ-বিদেশে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে। রবীন্দ্রনাথের একাধিক নৃত্যনাট্য তাঁর পরিচালনায় পরিবেশিত হয়েছে। এছাড়া গ্রন্থকারও তিনি। লিখেছেন ছোটগল্পও।

জীবনের প্রথমপর্ব মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না তাঁর। নড়াইল ছেড়ে তিনি পরিবারের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার চাকদহে আসেন। তারপর কিছুকাল কাটে উত্তরপাড়া হুগলীতে। বিদ্যালয়জীবন কাটে নানা জায়গায়। স্নাতক হন ডায়মন্ড হারবার কলেজ থেকে। শুভ্রাদেবীর মা স্বাস্থ্য দপ্তরে কাজ করতেন বলে জেলায় জেলায় ঘুরতে হত তাঁকে। তাই শুভ্রার পড়াশুনোও নানা জেলায়। এর কিছুদনি পর চাকরি নিয়ে শুভ্রা যোগ দেন মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে। শিক্ষকতার চাকরি, বীরসিংহ বিদ্যাসাগর বালিকা বিদ্যালয়ে। এর আগে ১৯৫৭-র ১৩ই জুলাই ১৭ বছর বয়সে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে– শুভ্রাদেবী তখন কলেজের ছাত্রী।

ঈর্ষণীয় দাম্পত্যসম্পর্ক ছিল দু'জনের। রন্ধনপটীয়সী শুভ্রাদেবী স্বামীর প্রিয় ঝিঙে পোস্ত, আলুপোস্তসহ নানা সুস্বাদ রান্না নিয়মিত নিজ হাতে করে স্বামীর রসনাতৃপ্তিতে নিয়োজিত থাকতেন। স্বামীর রাজনীতি থেকে বরাবর শতহস্ত দূরে থাকতেন, যদিও একবারমাত্র তার ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল। প্রথম যে বছর প্রণব মুখোপাধ্যায় লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ নেন ১৯৭৭ সালে, টানা দেড়মাস মালদহে পড়ে থেকে শুভ্রাদেবী স্বামীর সঙ্গে ভোটের কাজে সহায়তা করেছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে দিল্লির এমন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নেই, যাঁদের সঙ্গে শুভ্রাদেবীর সুসম্পর্ক ছিল না।

ইন্দিরার তো ছোটবোনের মতই ছিলেন তিনি। ইন্দিরার তাঁতের শাড়ি পছন্দ করে দিতেন শুভ্রা। ইন্দিরা শুভ্রার রান্না খাওয়ার জন্য শুভ্রার হেঁশেলে ঢুঁ মারতেন। কখনো মোচার ঘন্ট, কখনো মাছের নানা পদ আস্বাদন করে তৃপ্ত হতেন ইন্দিরা। ইন্দিরাকে নিয়ে তো একটি বইও রয়েছে তাঁর, নাম *চোখের আলোয়*। অসমিয়া ভাষায় বইটির অনুবাদও হয়। ২০১০ সালে বইটির অনুবাদ করেন সে-ভাষার লেখিকা সুস্মিতা মজুমদার। অনুবাদটির নাম *চোকুর পোহরত*। বইটি সে-বছরের ১৮ই নভেম্বর সাড়ম্বরে প্রকাশিত, যদিও অসুস্থতার কারণে প্রকাশনা অনুষ্ঠানে যেতে পারেননি শুভ্রদেবী। তবে নৃত্যনাট্যের দল নিয়ে তিনি দেশের বিভিন্ন জায়গার মত অসমেও গিয়েছেন। শুভ্রাদেবীর কন্যা শর্মিলা কত্থক নৃত্যের গুণী শিল্পী।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের কথায় আসা যাক আবার। সুদীর্ঘ ৫৭ বছরের সম্পর্কে মনোমালিন্য বা ঝগড়া হয়নি কখনো, সাংবাদিক ড. সৌরেন ভারতীয়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন শুভ্রা। তবে হ্যাঁ, বিয়ের পরপরই 'একবারমাত্র ঝগড়া হয়েছে', জানিয়েছেন শুভ্রা। স্বামীর কর্মব্যস্ততা, প্রত্যহ সাড়ে তিন কিলোমিটার হাঁটা ও একঘণ্টা পূজার্চনা আর স্ত্রীর অতিথি আপ্যায়ন, ঘর গেরস্থালি, রান্না, গান, ছবি আঁকা। শুভ্রার ছবির প্রদর্শনীও হয়েছে। তাছাড়া শুভ্রা দুটি অনাথ শিশুর দায়িত্ব নিয়ে তাদের বড় করে তোলেন। ইন্দিরার মৃত্যু-পরবর্তীকালে যখন দিল্লিতে ভয়াবহ দাঙ্গা, শিখ নিধনযজ্ঞ, তখন শিখ মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে সাহস জুগিয়েছেন

তাঁদের। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বহু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পেছনেই তাঁর ভূমিকা ছিল। একবার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলে জামিন দিতে রাজি হচ্ছিলেন না কেউ– কেন না কংগ্রেসে নরসিমা রাও তখন প্রায় অচ্ছুৎ, ব্রাত্য। গান্ধী-পরিবারের ক্রোধের মুখে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও শুভ্রা নিজে মতিলাল নেহরু রোডের বাড়িতে গিয়ে জামিন দিয়ে রাওকে সেই রাতে তিহার জেলে যাওয়া থেকে বাঁচান। প্রণব মুখোপাধ্যায় দিল্লিতে থাকলে রোজ স্নান আর পূজার্চনার পর নিয়মিত চণ্ডীপাঠ শেষে স্ত্রীর কপাল ছুঁয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। কর্ম অন্তে রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে মনের কথা, দেশের কথা হত স্বামীর, প্রত্যহ। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দুই ছেলেমেয়ে জয় ও পুতুল এবং বোন রেহানাকে নিয়ে (রেহানার তখন বিয়ে হয়নি) শেখ হাসিনা যখন শুভ্রার আশ্রয়ে, তখনো প্রতিরাতে শুভ্রা ওঁদের কাছে মেলে ধরতেন তাঁর শৈশবে দেখা যশোরের ভদ্রবিলা গাঁয়ের কথা, সেখানকার পরিবেশ ও পরিজনের কথা। সেইসব গল্প আবার পুনরুচ্চারিত হত স্বামীর সঙ্গে রাতে কথোপকথনকালে। শেখ হাসিনা কি তাঁর দুঃখরাতের অভিভাবিকার প্রয়াণে তাঁকে শেষ দেখা দেখতে না এসে পারেন? পারেন রেহানা?

বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা যখন শুভ্রা ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ থেকে ১৭ আগস্ট ১৯৭১ (মোটামুটি ছ'মাস), তখন প্রণব বাবু তাঁর ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রতি সপ্তাহে স্ত্রীর কাছে আসতেন। ঘাটালে ভাড়াবাড়িতে রাত্রিযাপন, মেঝেয় পাতপেড়ে খাওয়া– দু'জনের কাছেই ছিল মধুর স্মৃতি। শুভ্রার সেই বিদ্যালয়ের এককালের প্রধান শিক্ষিকা রমা রায় তাঁর স্মৃতিচারণায় জানিয়েছেন, শুভ্রা স্কুলে বাংলা ও ইংরেজি পড়াতেন। তাছাড়া সঙ্গীতজ্ঞ শুভ্রা স্কুলে কোন অনুষ্ঠানের আগে সঙ্গীতে তালিম দিতেন। প্রণব মুখোপাধ্যায় সাংসদ হবার পর বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, যদিও সে সময় নিজের ছেলেমেয়েরা গ্রামের স্কুলেই পড়ত।

স্বামীর প্রিয় খাবার তৈরি করা একদিকে, অন্যদিকে ছিল তাঁর প্রিয় যন্ত্র তানপুরা, ছিল 'গীতাঞ্জলি' গ্রুপ নিয়ে কখনো *চিত্রাঙ্গদা* কখনো অন্য নৃত্যনাট্য পরিচালনা। হিন্দিতেও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য *চণ্ডালিকা* পরিচালনা করে তিনি সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁদের দুই পুত্র অভিজিৎ এবং ইন্দ্রজিৎ, একমাত্র মেয়ে শর্মিলার কথা আগেই বলেছি। অভিজিৎ এখন সাংসদ। মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী ও নৃত্যশিল্পী। সম্প্রতি তিনিও রাজনীতিতে পা রেখেছেন।

দেশের রাষ্ট্রপতির স্ত্রী, যাকে বলা হয় 'ফার্স্ট লেডি'– ছিলেন নিরহংকার ও অনাড়ম্বর। তাই তিনি সময় পেলেই চলে যেতেন দিল্লির বাঙালি অধ্যুষিত চিত্তরঞ্জন পার্কে, তাঁর নিকট পরিচিতজনের সঙ্গে দেখা করতে। আবার রাষ্ট্রপতি ভবনে অতিথি আপ্যায়নে তাঁরই বদান্যতা ও পরামর্শে পরিবেশিত হত বাঙালি খাবার, বাজত রবীন্দ্রসংগীত। দীর্ঘদিন দিল্লি অবস্থানকালে তিনি থাকতেন সাবেক বাড়িটিতে। স্বামী রাষ্ট্রপতি হওয়ার সূত্রে তাঁর বাসগৃহ পরিবর্তিত হল রাইসিনা হিলস-এ। কিন্তু সে বাড়ির চেয়ে সাবেক বাড়িটাই (সে বাড়িতে একদা থাকতেন অসমের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ, বর্তমানে সাংসদ হওয়ার সূত্রে প্রণব-শুভ্রার পুত্র অভিজিৎ) ছিল শুভ্রাদেবীর অধিকতর পছন্দের। কিন্তু ১৯শে আগস্ট ২০১৫-এ তাঁর চিরস্থায়ী গৃহ রচিত হয়ে গেল অন্যত্র।

গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় গত ৪ আগস্ট শুভ্রাদেবীকে নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লির সেনা হাসপাতালে। প্রণব মুখোপাধ্যায় তখন উড়িষ্যায়। দ্রুত ফিরে আসেন তিনি দিল্লিতে– আইসিইউতে শুভ্রাদেবী তখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। দীর্ঘদিন ধরেই ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়েছিল একাধিকবার। এবারের সমস্যাটা ছিল আরো জটিল ও তীব্র। ডাক্তারি পরিভাষায় এ রোগের নাম হাইপোক্সিক স্কিমিক এনসেফালোপ্যাথি, যে-অসুখে মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ অক্সিজেন গ্রহণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যে-বারদিন তিনি সেনা হাসপাতালে ছিলেন– তাঁকে লাইফসাপোর্টে রাখতে হয়েছিল। অবশেষে ১৮ আগস্ট ২০১৫ তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। লোদি রোডের বৈদ্যুতিন চুল্লীতে পরদিন শেষকৃত্য হল তাঁর। তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর মরদেহের সঙ্গে কিছু চন্দনকাঠও দেওয়া হয়েছিল। শুভ্রাদেবীর শেষ-কৃত্যানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি হামিদ আনসারি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিসহ দেশের বহু রাজনৈতিক নেতা, ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শেষকৃত্যের পর শুভ্রাদেবীর অস্থি বিসর্জন দিয়ে আসা হয় হরিদ্বারের পবিত্র গঙ্গায়।

শুভ্রাদেবীর প্রয়াণ এক ধীমতী বিদুষীর প্রয়াণ, যাঁর জীবনজুড়ে বিরাজ করত চারুবাসনা, যিনি নিজে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ-অন্তপ্রাণ, জীবনযাপনে সনাতন ভারতের ঐতিহ্য, দাম্পত্য-সম্পর্কের চিরায়ত বোধ আর নিরবচ্ছিন্ন শুভৈষণাই ছিল যাঁর জীবনবোধ।

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়
ভারতের কথাকার, প্রাবন্ধিক

সৌহার্দ

শত তরুণের ভারত-দর্শন

রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে শান্তিনিকেতন

এস এম মুন্না

সফরটা ছিল স্বপ্নের মত। ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ আর চারটি প্রদেশে ঘোরাঘুরি– সে এক বিরল অভিজ্ঞতা। সফর শুরুর আগে থেকে সবার মুখে বর্ণিল আলোকচ্ছটা। ঘোরলাগা বিস্ময় ও মধুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কেটেছে গত ৪ থেকে ১১ অক্টোবর আনন্দময় আটদিন। এখানে-ওখানে ঘুরে ক্লান্ত হলেও বিরক্তি ছিল না কারুরই। হুইহুল্লোড় আর আনন্দ উল্লাসে কেটেছে দিনগুলো। দর্শনীয় স্থানগুলোতে ছিল সফরসঙ্গীদের সেলফি তোলার উন্মাদনা।

৪ অক্টোবর ২০১৫ দিল্লিতে পা রেখেই শুরু আট দিনের ভারত দর্শন বাংলাদেশি শত তরুণের– ১১ অক্টোবর বিকেলে শেষ সেই আটদিনের বিরামহীন পথচলা। তবে সবকিছু ছাপিয়ে ছিল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান। রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার হলে সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি বাংলাদেশি তরুণ প্রজন্মের একালের ভাবনার কথা শুনেছেন। বক্তব্য রেখেছেন তরুণ সমাজের উদ্দেশে। বলেছেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে সোনার বাংলা গড়তে এ দেশের যুব সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। তরুণ প্রজন্ম চাইলে বাংলাদেশকে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। দেশের কল্যাণে যুব সমাজকে কাজে লাগাতে বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শও দিয়েছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি।

সফরের তৃতীয় দিন মঙ্গলবার পড়ন্ত বিকেলে নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রণব মুখার্জি আরও বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণের চরিত্র এবং সংস্কৃতিতে ব্যাপক মিল রয়েছে। দু'দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে রয়েছে আত্মীয়তা থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক। বাংলাদেশ ও ভারত একই সঙ্গে উন্নতির পথে হাঁটতে পারে। এজন্য দু'দেশের সরকার ও জনগণের পরস্পরকে জানা ও বোঝা একান্ত প্রয়োজন। অতীত এবং বর্তমানের মত ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার বিকল্প নেই।' প্রণব মুখার্জি তার বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনীর* প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর এই আত্মজীবনী কখনও ভোলার নয়। একজন বাঙালি হিসেবে এই আত্মজীবনী নিয়ে গর্ব করা উচিত।' বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ নিয়েও কথা বলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারতের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব রাজীব গুপ্তা। যুব প্রতিনিধিদলের পক্ষে বাংলায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান ও ইংরেজিতে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ঊর্মি রহমান সিলভী। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির হাতে শুভেচ্ছাস্বরূপ নৌকা, রিকশা ও অটোরিকশার রেপ্লিকা তুলে দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনের প্রথম সচিব (রাজনৈতিক ও তথ্য) রাজেশ উইকে ও যুব প্রতিনিধিদলের নারী প্রতিনিধি একাত্তর টেলিভিশনের স্টাফ রিপোর্টার কাবেরী মৈত্রেয়। প্রণব মুখার্জির সাক্ষাৎ শেষে প্রতিনিধিদলটি রাষ্ট্রপতি ভবনের ব্যাংকুয়েট হল ঘুরে ঘুরে দেখেন।

প্রণব মুখার্জির সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানের আগে প্রতিনিধিদল ৪ অক্টোবর ইন্ডিয়া গেট পরিদর্শন করেন। আরও ছিল জাতীয় জাদুঘর, কুতুব মিনার, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ফরেন ট্রেড কার্যালয় এবং সে দেশে সর্বাধিক মোটরবাইক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিরো মোটোকর্পের কার্যালয় ঘুরে দেখা। জাতীয় জাদুঘরের বিপরীতে সে দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে ফটোসেশনে অংশ নেয় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পর ৬ অক্টোবর রাতে স্থানীয় হোটেলের বলরুমে আয়োজন করা হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সেখানে কথক ও ভরতনাট্যম নৃত্যসহ বিভিন্ন পরিবেশনা উপহার দিয়েছিলেন ভারতের বন্ধুরা। বাংলাদেশি বন্ধুরাও পরিবেশন করেছিলেন দেশাত্মবোধক, লোকগান, নাচ। পর দিন ৭ অক্টোবর আগ্রার তাজমহল ও আগ্রা ফোর্ট ঘুরে দেখেন প্রতিনিধিদলটি। এর আগে দ্রোণাচার্য প্রকৌশল কলেজ পরিদর্শন ছিল দারুণ এক অভিজ্ঞতা। আগ্রা থেকে রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর যাওয়ার পথে বিশেষ পাওয়া ছিল উত্তর প্রদেশের ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ দরজা দর্শন। প্রতিনিধিদলটি ওইদিন বিকেলে জয়পুরে পৌঁছলে সাক্ষাৎ হয় রাজস্থানের যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী গজেন্দ্র সিং খিমসার সঙ্গে। তাঁর উষ্ণ অভ্যর্থনায় সবাই মুগ্ধ। তখনও বিস্ময় আর মুগ্ধতার ঘোর যেন কাটতে চায় না। ঘোর থাকতেই থাকতে সবাই উপস্থিত হয় স্থানীয় টেগোর পি জি গার্লস স্কুলে। এখানে ছিল দুই দেশের সংস্কৃতি বিনিময় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া ও 'জয়বাংলা' স্লোগান দেওয়া ছিল যুব প্রতিনিধিদলের অন্যরকম অনুভূতি। পর দিন ৮ অক্টোবর শুরু রাজস্থান ঘুরে দেখা। তবে বিশেষ আকর্ষণ ছিল আগের রাতে জয়পুরের টং রোডে

'চোখি ধানি' নামে একটি আর্টিসান ভিলেজ পরিদর্শন। এই ভিলেজটি একবার চক্কর দিলে রাজস্থানের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন রাজস্থানের রাজকীয় রূপ দেখতে হলে এই স্থানটি ঘুরে দেখতে হবে। রাজস্থানী কায়দায় অতিথিবরণ থেকে শুরু করে মরুজাহাজ খ্যাত উটের পিঠে চড়ার সব রকম ব্যবস্থা করে রেখেছে এই আর্টিসান ভিলেজের কর্তৃপক্ষ। আরও আছে লোক নৃত্য, সাপের খেলা প্রদর্শন, বায়োস্কোপ, জাদু খেলা, সার্কাস, শক্তি পরীক্ষাসহ অনেক কিছু। রাজস্থানী পোশাকের বিপুল সমাহার রয়েছে এখানে। কী নেই– কারুকাজময় নাগরা থেকে শুরু করে হাতেবোনা শাল, শতরঞ্জি আরও কত কী!

রাজস্থান এসেছেন অথচ রাজস্থানী খাবার চেখে দেখা হবে না তা কি হয়! এই ভিলেজের ভেতরেই রাজস্থানী খাবার চেখে দেখার সবরকম বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা রাতের আহারের জন্য একটি খাবারঘরে হাজির হন। মাটিতে আসন গেড়ে বসতে হয় সবাইকে। সবার সামনে জলচকি। সেখানে সাজানো পাতার থালা ও ছয়টি পাতার বাটি। দুটি মাটির গ্লাস। থালি নামে পরিবেশন করা হল জিভে জল আনা ২৫ পদের খাবার। পাতার থালার চারপাশ ঘিরে গোল করে সাজিয়ে গোটাছয়েক বাটিতে পরিবেশন করা হয় আলুর দম, শুক্তো, আলুর চাট, মরিচের আচার, ডাল মাখনা, মোহর তাল, আটা ও যবের রুটিসহ আরও কত কী! প্রতিটি আইটেমই সুস্বাদু, তবে ঘি-এর প্রাচুর্য ও মসলার আধিক্য লক্ষণীয়। বিশেষ করে মসলাযুক্ত খিচুড়ির সঙ্গে চিনি আর ঘিয়ের মিশ্রণ অমৃতের স্বাদ এনে দেয়। চোখি ধানিতে লোকজ ফর্মে ছোট ছোট দোকানগুলো এক-একটি ঐতিহ্যের পরিচয় বহন করছে।

১৭২৮ সালে আম্বর-এর শাসক মহারাজা জয় সিং-২ এই জয়পুর নগরী প্রতিষ্ঠিত করেন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। তাঁর নামানুসারেই নগরীর নামকরণ। এই শহরের সব বাড়ির রঙ গোলাপী। রাস্তার দু'পাশের সুরম্য ভবনগুলোর বেশিরভাগই উজ্জ্বল গোলাপী বা ফিকে গোলাপী বর্ণে রঞ্জিত– যা দেখে মনে হল, এই নগরীর নামকরণ 'পিংক সিটি' সার্থক হয়েছে। জয়পুরে প্রবেশ করে মনে হল, এটি পরিকল্পিত, পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত, গোলাপী বর্ণে বর্ণিল একটি ছিমছাম ছবির মত নগরী। যেদিন জয়পুর পৌঁছলাম সেদিনই গোল্ডেন টিউলিপ হোটেলে চেক আউট করে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল দুটি রাজস্থানী মেয়ে তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে মায়ের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছে। দু'জনের মাথায় নকশা আঁকা রঙিন দুটো কলস, তিনজনেরই গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা কুচি দেওয়া স্কার্ট, উপরে টপস্, মাথা ও বুকের ওপর ওড়না। লেহেঙ্গা বা ঘাঘরা চোলি ধরনের পোশাক, তবে বিশেষত্ব হল ড্রেসগুলো উজ্জ্বল বর্ণের লাল, নীল, হলুদ বর্ণিল এবং কাচের ছোট ছোট আয়না দিয়ে সুচিকর্ম করা।

পর দিন ৯ অক্টোবর শুক্রবার অসাধারণ শিল্পকীর্তি ও স্থাপত্যকলার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সকাল সাড়ে আটটায় পৌঁছলাম 'আমের ফোর্টে'র সীমানায়। সেখানে অপেক্ষা করছে ২০টি জিপ গাড়ি। বাস থেকে নেমেই সবাই উঠে বসল সেই জিপ গাড়িতে। মিনিট পাঁচেকের মাথায় 'আমের ফোর্ট'-এর মূল ফটকে গিয়ে জিপ থামল। এরপর পায়ে হেঁটে ফোর্টে প্রবেশ। ফোর্টে প্রতিনিধিদলটি পা রাখামাত্র ওপর থেকে বেজে উঠল নাকাড়ার আওয়াজ। মনে হল যেন আমরা কোন যুদ্ধে এসে পড়েছি। দলগত ফটোসেশন শেষ করে দর্শনীয় এই স্থানের দিকে যত এগিয়ে যাচ্ছি, তত চোখে পড়তে লাগল পাথরের অসংখ্য উঁচু-নিচু পাহাড়। দেখলাম, পাথরের গায়ে হাতি-ঘোড়া-বাঘ ও মূর্তি অপরূপভাবে খোদাই করে নগরীকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার কি কঠিন প্রয়াস! আমের ফোর্টে এসে দু'পাশে পাথরের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পাথরের তৈরি উঁচু রাস্তা দিয়ে দুর্গের দিকে এগোলাম। ১৫৯২ সালে আমের ফোর্টের নির্মাণ কাজ শুরু করেন রাজা মান সিংহ-১, যদিও আমের ফোর্টের অপরূপ স্থাপত্য ও প্রাচীরের পেইন্টিংগুলো রাজপুতদের উন্নত সাংস্কৃতিক মননবৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। আমের ফোর্টে পাথরে খোদাই করা

মূর্তি ও সূক্ষ্ম আয়নার কারুকাজ সত্যিই আশ্চর্যজনক! আমের ফোর্ট উজ্জ্বল চকচকে সাদা মার্বেল পাথর ও লাল বেলেপাথরে তৈরি, ফোর্টের সামনে একটি হ্রদ আছে, হ্রদের স্থির পানিতে দুর্গের স্বচ্ছ আয়নার মত প্রতিচ্ছবি ভারি সুন্দর দেখায়। দুর্গের ভিতরের দেয়ালে ও সিলিংয়ে সূক্ষ্ম আয়নার শৈল্পিক কারুকাজ হলঘরের রাজকীয় ভাব ফুটিয়ে তুলেছে। চারপাশের বিশাল প্রাচীর বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য নির্মিত হয়েছিল। এখানে দেখতে পেলাম অসংখ্য সুসজ্জিত হাতির সমাহার। হাতির পিঠের ওপরে বিভিন্ন বর্ণের আসন, যা ছোট আয়না ও এমব্রয়ডারি দিয়ে সুচিকর্ম করা। ফোর্টটি চারটি অংশে বিভক্ত। এখানে জাগ্রত কালী মন্দির, যা শীলামন্দির নামেও পরিচিত, ফোর্টেরই একটি অংশ। বড় বড় রূপার সিংহ মূর্তি ও দরজা প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। প্রতিনিধিদলের কেউ কেউ রাজস্থানী পাগড়ি কিনলেন। সেই পাগড়ি পরে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সেলফি তুলতে।

আমের ফোর্ট দেখা শেষ হল বীণবাদনের সুর-মুর্চ্ছনা উপভোগ করতে করতে। এবার গাড়ি ছুটল হাওয়া মহলের উদ্দেশে। অজানা কারণে কাছ থেকে দেখার সুযোগ ছিল না সেদিন। গাড়িতে বসেই দেখা হল হাওয়া মহল। সকালের সোনা রঙ সূর্যের আলোকচ্ছটা হাওয়া মহলের সুরম্য পাঁচতলা অট্টালিকার ওপর পড়ে এক মনোমুগ্ধকর বর্ণিল আভা ও মোহনীয় রূপের সৃষ্টি করেছে, যা থেকে দৃষ্টি ফেরানো সত্যিই কঠিন!

জয়পুরের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বাস গিয়ে থামল শ্রী বলরাম আদর্শ বিদ্যামন্দিরে। কড়া রোদ উপেক্ষা করে ওই বিদ্যামন্দিরের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ঢোল-বাদ্যির সুরে স্বাগত জানায় যুব প্রতিনিধিদলটিকে। কপালে তিলক আর হলুদ গাঁদা ফুল দিয়ে রাজস্থানী কায়দায় বরণ করে নেওয়া হয় প্রতিনিধিদলটিকে। ওই বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে প্রতিনিধিদলের সম্মানে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যেখানে ছিল রাজস্থানী নৃত্য ও সংগীত। এখানে অতিথিদের বরণ করা হয় ১২ হাত দৈর্ঘ্যের ঝলমলে রঙিন কাপড়ের পাগড়ি দিয়ে। ঘণ্টাদেড়েকের উষ্ণতামুখর আয়োজন শেষ করে বিদায় জানানো হয় প্রতিনিধিদলটিকে। মধ্য-গগনে গনগনে সূর্য উত্তাপ ছড়াল। শিশু-কিশোররা সেই রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বিদায় জানায় প্রতিনিধিদলকে। জয়পুর সিটিতে প্রবেশ ও নির্গমনের পথিমধ্যে পড়ে সুড়ঙ্গ। পাহাড় কেটে বানানো এই সুড়ঙ্গটি অতিক্রম করার সময় বিস্ময় প্রকাশ করেন যুব প্রতিনিধিদলের প্রতিটি সদস্য। সন্ধ্যার কিছু আগে জয়পুর এয়ারপোর্ট থেকে বিমানযোগে কলকাতার উদ্দেশে পাড়ি জমায় প্রতিনিধিদলটি। আর পেছনে পড়ে থাকে রাজস্থান দেখার সুখস্মৃতি। কলকাতা দর্শনপর্ব শুরু হয় রবীন্দ্রস্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখার মধ্য দিয়ে। সফরের শেষ দিন ঘুরে দেখা হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, জাতীয় জাদুঘর ও ইডেন গার্ডেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। প্রতিনিধিদলের সদস্য তরুণ আম্পায়ার তারিকুল হাসান মাসুমের মন ছুঁয়ে গেছে অন্য এক অনুভূতি। তাঁর ভাষায়, 'বিদেশের মাটিতে এতজন বন্ধু মিলে জাতীয় সংগীত গাওয়ার স্মৃতিটা স্মরণীয় হয়ে

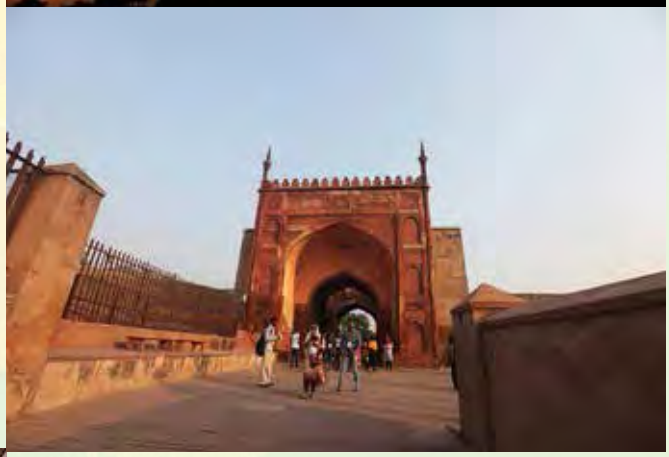

থাকবে।' *চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর*-এর সাংবাদিক নুশরাত ইমপা, *একাত্তর*-এর কাবেরী মৈত্রেয়, *বাংলা ভিশন*-এর এস এম ফয়েজ, *প্রথম আলো*র তপতী বর্মন, *কাম্পাস টু ক্যারিয়ার*-এর অঞ্জলি সরকার, *যমুনা টিভি*র কামরুল হাসান রিফাত, *কালের কণ্ঠে*র ফটোসাংবাদিক তারিক আজিজ নিশক, *ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভি*র রিশাদ হুদা অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, এই সফরে ১০০জন অচেনা মানুষ বন্ধু হয়ে গেল। এতকিছুর ভিড়ে এইতো সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি! শিক্ষার্থী শুভানল, জাভেদ, ফারুক, ফারিবা, সঙ্গী, তারেক, সামিউলসহ আরও অনেকেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন এই সফর নিয়ে।

লেখা এসএম মুন্না সাংবাদিক
ছবি রিদোয়ান আদিদ রুপন
ভারত সরকারের আমন্ত্রণে সফরকারী প্রতিনিধিদলের সদস্য

ছোটগল্প

জন্মদিনে

কৌস্তভ বসু

কাটা পা পচা পাঁকে শুয়ে। ফ্ল্যাশব্যাকে বিদ্যুতের স্পিডে স্লাইড শোতে একটার ঘাড়ে আর একটা দৃশ্য বাইবাই ঘোড়া ছোটাল, গতকালের দুপুর। বসন্ত বিহার পুলিশ স্টেশনের পাশে এঁদো খালে যুবতীর কাটা লাশ। অনতিদূরে হাতের টুকরোয় মাংস খুঁটছে শুয়োর। মেয়েটি কে? মাথা নিখোঁজ।

সামনে খোলা মিড ডে, ফ্রন্ট পেজে বড় ছবি। পচা খালে কাটা পা। চারধারে হাইলাইট করে এডিটোরিয়াল গোল দাগ... চোখে আঙুল দিয়ে নির্দেশ একবিংশের অন্ধ মানবিকতা। মেয়েটির দোষ? তদন্ত চলছে। সেরিবেলামে রিওয়াইন্ড 'নট আ লাভ স্টোরি' ট্রেলর। কন্নড় অভিনেত্রীর জীবন্ত সেন্সসনাল কাহিনির উপর বেস করে তামিল পরিচালকের ছবি। একটি মেয়ে তার এক প্রেমিকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে অন্য প্রেমিককে টুকরো টুকরো করছে। (প্রেমিককে না প্রেমকে?) চারপাশে তাজা রক্ত ছড়িয়ে। বড় বড় করে সাদা স্ক্রিনে ফুটে উঠছে 'It's from the heart, but not for the faint-hearted'। ভালবাসা কী রাক্ষুসে!

সামনে গরম ক্যাপুচিনো। উপরের স্তরে বাদামী কোকোতে হাল্কা পত্রাকার ডিজাইন– ভালবাসা। সুগারপ্যাক ছিঁড়ে কিছু চিনির গুঁড়ো ছড়িয়ে সাদা চামচ নাড়তে বাদামী ভালবাসা ভেঙে মিলিয়ে গেল। ক্যাপুচিনো হয়ে উঠল মিষ্টি।

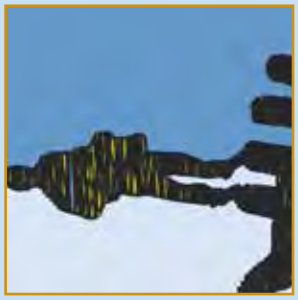

পাশের মেয়েটি বিল পে করে উঠে গেল। কফির দাম দিতে বসে আছি। ডান পাশের কর্নার টেবিলে চোখ পড়ল। বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা। আরে, মেয়েটি ভুল করে ফেলে গেছে! তাকালাম দরজার দিকে। মেয়েটিকে দেখতে পেলাম না। খুব দূরে যাবার কথা নয়, সবে তো বেরিয়েছে। বেয়ারাকে চটজলদি ডেকে বিলটা মিটিয়ে বইটা তুলে নিলাম। দুপাতা ওল্টাতে চন্দ্রবিন্দুর একটা গানের দুটো লাইন চোখে পড়ল... 'ভাল থেকো শুভ জন্মদিন, কথাগুলো আজও অমলিন'...

পাশের কাচের দেয়ালে চোখ পড়ল। দুটি নেড়িকুকুর সিমেন্টের রাস্তায় একে অপরকে জড়িয়ে সোহাগে-সঙ্গমে মাতাল। পৃথিবী ডোন্ট কেয়ার, দুজনে আদিম রিপুতে অন্ধ। হঠাৎ অনুভব করলাম, ভালবাসা কী ভালগার!

মুখ ফেরালাম। চোখে চোখ ডানপাশের কর্নার টেবিলে। নীল জিন্স, ভি-গলা বাসন্তি টি-সার্ট আঠাশ-উনত্রিশ মেয়েটিও দেখছিল কার্নিভোর সঙ্গমলীলা। চোখে চোখ পড়তে কিছুটা অপ্রস্তুত। অজান্তেই মুখটা কেমন রাঙিয়ে গেল। রিমলেস চশমার আড়ালে চোখ ফেরাল। লক্ষ্য করলাম ঠোঁটের উপর ডানদিকে একটা ছোট কালো তিল। দু-তিনটে চুল কপালে খামখেয়ালি লেপ্টে। ফর্সা গ্রীবা কিছুটা নেমে দৃষ্টি আটকে গেল, বুকের ঢেউ খানিক স্পষ্ট। মেয়েটি মুখ তুলল। চোখে চোখ। এবার আমি অপ্রস্তুত। ঢোক গিলে ক্যাপুচিনোর কাপে মুখ ফেরালাম। আড়চোখে খেয়াল করলাম ওর ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হেমন্তের বিকেল।

আমার এখন অখণ্ড অবসর। ল্যাব থেকে বেরিয়ে বিশেষ কিছু করার নেই। চলে এলাম ঠাণ্ডা কফি শপে। দেবলীনাকে ফোন করেছিলাম। ওর মাইগ্রেনের ব্যথাটা ফের বেড়েছে। রেস্ট নিতে বলে ফোন রেখে দিলাম। এই সময়টা আমার সেরকম কিছু করার থাকে না, বা বলা ভাল, ঠিক কি করব ভেবে উঠতে পারি না। বন্ধু-বান্ধব কারওর বাড়ি গেলেই হয়। কিন্তু ভিতর থেকে কেমন একটা আলস্য গতি শ্লথ করে দেয়। মনে হয় অনর্থক কথার থেকে এক কাপ শান্ত ক্যাপুচিনো অনেক রিফ্রেসিং।

দেয়ালে সাঁটা টেলিভিশনের বড় স্ক্রিনে আমীর খান নাচছে... দিল্লি বেলি। এন্টারটেনিং ছবি। দিনকয়েক আগে দেখলাম। পর্দায় চোখ রেখে ক্যাপুচিনোর কাপে একটা চুমুক দিলাম। কিছু কফি জিহ্বার আদরে মিষ্টি নেশা ছড়িয়ে ভিতরে পথ হারাল। যাবার আগে একটা পাতলা হাল্কা বাদামী স্মৃতি রেখে গেল গোঁফের গায়ে। টিস্যু পেপারে মুখটা মুছে চোখ ফেরালাম অন্য টেবিলে। গোল টেবিলগুলো মোটামুটি ভরা। সবেই কিছু ছোটগল্প কম-বেশি ছড়িয়ে। কিছু অল্প-বয়সী কলেজপড়ুয়া ছেলেমেয়ে নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টায় মশগুল। এক আকাশিনীল একজিকিউটিভ ল্যাপটপে কোন অফিসিয়াল এসাইনমেন্টে মগ্ন। কফি শপটাও কি তার অফিসের অঙ্গ? পৃথিবী কী গতিশীল! নিজের দিকে তাকালাম। শালগ্রাম শিলার মত এক কাপ কফি নিয়ে সময় বধ করছি। এক ছাদের তলায় কী অসাধারণ বৈপরীত্য!

ডানপাশের কর্নার টেবিলে মোবাইল বেজে উঠল। টানা তিনদিন ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টির পর ঝলমলে তাজা রোদের মত একমুঠো হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে কেতাবি কণ্ঠে মেয়েটি বলল, হাই। ওদিকের কথা কানে এল না। এদিকের লাইনগুলো পরপর সাজালে এমন দাঁড়ায়:

থ্যাঙ্ক ইউ

...নাথিং স্পেসাল

(একটু গ্যাপ... হাসি...)

নো ম্যান, আই এম ভেরি বিজি... এখন? এই একটু কাজে বাইরে আছি...

মেয়েটি বাঙালি! একবার তাকালাম। ওর চোখ টেলিভিশনের পর্দায়। সামনে প্লেটে একটা আধাকামড় স্যান্ডউইচ... আধকাপ কফি... পাশে উপুড় করে খোলা একটা বই। বইটার কভার দেখে একটু স্থির হলাম। বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা। আশ্চর্য! আজকের দিনে একটি আটাশ-উনত্রিশ বাঙালি মেয়ে দিল্লির মত শহরে এমন ঠাণ্ডা ঝাঁ চকচকে কফি শপে বিষ্ণু দে-র কবিতা পড়ছে! একবার ভাবলাম মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করি! পরমুহূর্তে মনে হল এ বড় নির্লজ্জ হ্যাংলামো! ও যদি আমল না দেয়, কিংবা খারাপ কিছু মনে করে। দেবলীনার নির্দোষ মুখটাও মনে পড়ল। বেচারী অনেক বিশ্বাস আর আশা নিয়ে চোদ্দশো কিলোমিটার দূরে রয়েছে। জানতে পারলে রক্ষে থাকবে না। আসল কথা কিছুই বুঝবে না। অমন ডাগর অক্ষিকোটরে শ্রাবণধারায় আপন খেয়ালে কী আষাঢ়ে গল্পই না ফেঁদে বসবে! নারী মন বড়ই সন্দেহপ্রবণ! অতএব বিদ্যুতের মত সহসা অঙ্কুরিত ইচ্ছার চারাগাছটিকে নির্মম হাতে উৎপাটন করে সামনের ক্যাপুচিনোয় মন দিলাম। তবে মেয়েটির 'একটু কাজে' ব্যস্ত থাকার রকম দেখে বেশ হাসি পেল।

সময়টা ধীরে ধীরে এভাবেই বধ হচ্ছিল। এদিক ওদিক... টেলিভিশন... গোল টেবিল... হাসি... ল্যাপটপ... মিড ডের খোলা পাতা... যুবতীর কাটা পা... একটা দুটো এসএমএস... কফি কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ঘড়ির ডায়ালে তাকালাম, সাতটা পাঁচ। না উঠতে হবে। ঘরে গিয়ে ল্যাপটপটা খুলে বসতে হবে। পেপারটার কিছু কাজ বাকি। কাল সকাল দশটায় আবার বসের সঙ্গে মিটিং। উফ! অদ্ভুত এক ক্লান্তি একমুঠো দীর্ঘশ্বাসে সম্পৃক্ত হয়ে বেরিয়ে এল। বেয়ারাকে ডাকলাম, চেক প্লিজ।

পাশের মেয়েটি বিল পে করে উঠে গেল। কফির দাম দিতে বসে আছি। ডান পাশের কর্নার টেবিলে চোখ পড়ল। বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা। আরে, মেয়েটি ভুল করে ফেলে গেছে! তাকালাম দরজার দিকে। মেয়েটিকে দেখতে পেলাম না। খুব দূরে যাবার কথা নয়, সবে তো বেরিয়েছে। বেয়ারাকে চটজলদি ডেকে বিলটা মিটিয়ে বইটা তুলে নিলাম। দুপাতা ওল্টাতে চন্দ্রবিন্দুর একটা গানের দুটো লাইন চোখে পড়ল... 'ভাল থেকো শুভ জন্মদিন, কথাগুলো আজও অমলিন'... প্রাপক বা প্রেরক, কারওর কোথাও কোন নাম উল্লেখ নেই। নিচে শুধু আজকের তারিখ।

কফিশপের কাচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে খানিকটা হাঁটতে মেয়েটিকে দেখতে পেলাম। নিজের খেয়ালে দাঁড়িয়ে আছে। ওরও কি আমার মত অখণ্ড অবসর? কোন তাড়া নেই? অল্প দূরে নেড়ি কুকুর দুটি ভালবাসায় পরম সোহাগে দুজন দুজনকে আদর করছে। মেয়েটি এক দৃষ্টে ওদিকে তাকিয়ে।

– এক্সকিউজ মি

মেয়েটি ভূত দেখার মত চমকে ঘাড় ফেরাল।

– এটা বোধহয় আপনি ফেলে এসেছেন...

– ও, থ্যাঙ্ক ইউ। হাত বাড়িয়ে মেয়েটি বইটা নিল। ঠোঁটে হাল্কা কৃতজ্ঞতা।

– শুভ জন্মদিন। কিছু না ভেবে কথাটা বেরিয়ে এল আমার ভিতর থেকে।

মেয়েটি তাকাল। কয়েক মুহূর্ত স্থির। ওর চোখের ঈশান কোণে সহসা এক নোনো মেঘ টের পেলাম। রিমলেস চশমার পিছনে চোখের পাতাদুটো অজান্তে তির তির কেঁপে উঠল। কিছু বলল না। পাতলা ঠোঁটের কোণে শুধু লেগে অস্পষ্ট উষ্ণ আন্তরিকতা।

নেড়ি কুকুর দুটো পরম আশ্লেষে দুজন দুজনকে চাটছে। ওদের ভিতর কোন কুয়াশা নেই। সত্যি, ভালবাসা কী সুন্দর!

আমরা দুজন দুজনের চোখে তাকালাম। এবার কোন অস্বাচ্ছন্দ্য টের পেলাম না। দুজনেই হেসে উঠলাম একসাথে।

কৌস্তভ বসু ভারতের তরুণ গল্পকার

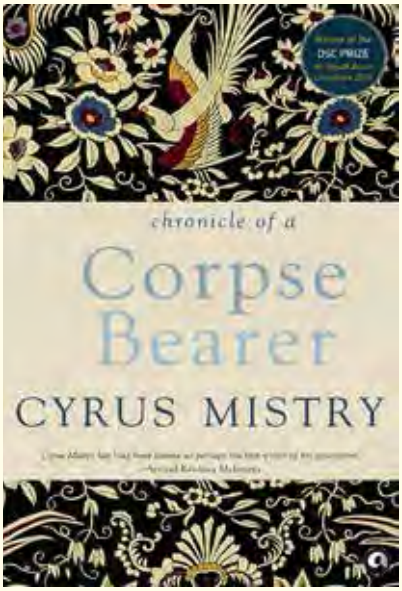

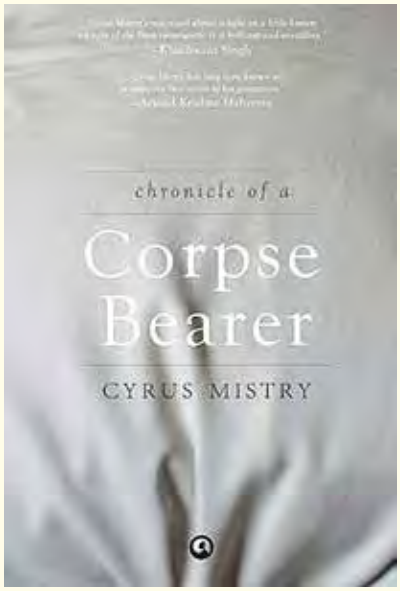

গ্রন্থ আলোচনা

ক্রনিকাল অফ আ কর্পস বিয়ারার

খাণ্ডিয়া জীবনের অজানা আলোখ্য

হোসেনউদ্দিন হোসেন

ক্রনিকাল অফ আ কর্পস বিয়ারার সাইরাস মিস্ত্রির একটি ইংরেজি উপন্যাস। খাণ্ডিয়া সমাজের অজানা জীবন এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

'খাণ্ডিয়া' হল একটা জনগোষ্ঠী। ইতিহাস থেকে জানা যায়, অষ্টম শতকে পারস্য থেকে পার্সিরা ভারতবর্ষে এসে বসতি পড়ে তোলে। পার্সিরা অগ্নি-উপাসক। জরথ্রুস্ত্র পার্সি ধর্মের প্রবর্তক। তিনি তাঁর অনুসারীদের অছিয়ত করেন যে, মৃত্যুর পর তাদের শবদেহ শকুন দিয়ে খাইয়ে সৎকারের জন্য টাওয়ার অফ সাইলেন্সে নিয়ে যেতে হবে। এই টাওয়ারে মৃতদেহ যারা বহন করে নিয়ে যায়– তাদেরকে বলা হয় খাণ্ডিয়া। এই পেশায় যারা নিযুক্ত– সমাজে তাদের অবস্থান হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণ মুচি-মেথরদের সমতুল্য। পার্সি সমাজে এরাই হল ধর্মের নামে নিগৃহীত দলিত শ্রেণী। ঔপন্যাসিক সাইরাস মিস্ত্রি এই দলিত ও সমাজ কর্তৃক অবহেলিত শ্রেণীর জীবনযাপন নিয়ে এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন।

সাইরাস মিস্ত্রী তাঁর উপন্যাসের শুরুতেই শবদেহ সৎকারের নিয়মবিধি সম্পর্কে একটি তথ্যভিত্তিক বিবরণে উল্লেখ করেছেন যে, পার্শি-মরদেহের সারা শরীরে বলদের তীব্র গন্ধময় মুত্র দিয়ে ঘষে-মেজে লেপন করে দেওয়া হয়। তারপর শরীরের যেখানে যেখানে ছিদ্র আছে, সেখানে মলম মাখিয়ে নতুন মসলিন কাপড় পরিয়ে কোমরে পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়া হয়। সূর্য অস্তমিত হওয়ার আগেই সৎকারের কাজটি সম্পন্ন করতে হয় এবং তিনবার হাততালি দিয়ে শোকগ্রস্তদের জানানো হয় যে মৃতের দেহ শকুনের খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

মৃত ব্যক্তির দেহ কোন মুসলমান বা হিন্দু স্পর্শ করতে পারেন না। এটা সম্পূর্ণ মান-সম্মানের ব্যাপার। এ সম্পর্কে উপন্যাসের একটি চরিত্র কাউসি নামে একজন খাণ্ডিয়া বলেছে: 'When it comes to disposal of the corpse our religion is so sensible. We don't pollute the earth by burying nor the air cremating... everything is so nice in our religion-- must be the finest in the world; we are not asked to fast, avoid liquor or congregate on Sundays for prayer.' (পৃ. ১৭২)

উপন্যাসের মূল চরিত্র ফিরোজও একই রকম বয়ান দিয়েছে। পার্সিরা খুব আত্মসচেতন। সে সৎকার করার জায়গায় যেত। যে যে জায়গাগুলোতে সে যেত– 'No self respecting Parsi would care to be seen; slums, shanty towns, areas in which low life and sin and poverty flourished; dens of vice and iniquity, where gambling, boozing and whoring thrieved.' (পৃ: ৬৮)

সবধর্মে যেমন রক্ষণশীলতা আছে, তেমনি পার্সিধর্মেও রক্ষণশীলতা আছে। উপন্যাস জোসেফ কাঙ্গার নামে একজন ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে আদিতে জরথ্রুস্ত্রপন্থী ছিল না। পরে পার্সি ধর্মাবলম্বী হয়। সে ছিল ফিরোজের একান্ত বন্ধু। কাঙ্গার নিজের ইচ্ছেমত চলাফেরা করত। তার মৃত্যুর পর পার্সি ধর্মানুসারে তার শবদেহ টাওয়ার অফ সাইলেন্সে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। গোড়াপন্থীরা তাকে পার্সিমতে সৎকার না করে বুচিয়ার নেতৃত্বে শবদেহ মধ্যরাতে চুরি করে খ্রিস্টানদের গোরস্তানে দাফন করতে নিয়ে যায়। গোরস্তানের রক্ষক গোমেজ মরদেহ দাফন করার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে বলে যে, খ্রিস্টান ধর্মানুসারে মরদেহ কফিনে পুরে দাফন করতে হয়। বিনা কফিনে দাফন করা ধর্মসম্মত নয়। এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে গোরস্তানের রক্ষক আরো বলে যে, কফিনে দেহটা না পুরলে কুকুর, হায়না এবং ধেড়ে ইঁদুরের দল কবর খুঁড়ে দেহটা তুলে বাইরে আনে। এই উপন্যাসের কাহিনির কথকের নাম ফিরোজ এলচিদানা। সে নিম্নবর্গের মানুষ নয়। পার্সিসমাজের একজন ধর্মযাজকের ছেলে। তার পিতার নাম ফ্রেমরোজ। ফিরোজ ধর্মযাজক হবে বলে পিতার নিকট থেকে শিক্ষা এবং দীক্ষা নিয়েছিল। সে ছিল হতাশাবাদী। জগত সম্পর্কে তার ধারণা ছিল বিরূপ। জগতটা তার কাছে কারাগারের মত মনে হত। আরো মনে হত যে সে এখানে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। এই অবস্থা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করার বদলে পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবত। তার স্বভাবটা হয়ে পড়ে পলায়নবাদী।

ফিরোজের মা ফিরোজকে নাভারহুড হওয়ার জন্যে জোরালো তাগিদ দিতেন। তিনি চাইতেন তার ছেলে নাভারহুড হওয়ার বিষয়ে দীক্ষা গ্রহণ করুক। এ সম্পর্কে ঔপন্যাসিক লিখেছেন যে নাভার হতে গেলে– 'One has to acquire a reasonable fluency in scriptual passage.'

ফিরোজ অন্তর দিয়ে ভালবাসত অসাধারণ সুন্দরী সেপিডেকে। এই মেয়েটি ছিল স্বভাবে লজ্জাবতী। তার পিতা টেমুরাস ছিলেন মদখোর ও মাতাল। এই মদ্যপ-মাতালের মেয়ে ছিল সম্পর্কে তার বোন। মেয়েটি ছিল কোমল স্বভাবের। সে বনের পশু-পাখিদের প্রতি ছিল যত্নশীল। প্রকৃতি ও জগত নিয়ে সে ভাবত।

টেমুরাস তার মেয়ের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে ফিরোজকে কয়েকটি শর্ত জুড়ে দেয়– প্রথম শর্ত হল সেপিডেকে আগে বিয়ে করতে হবে; দ্বিতীয় শর্ত হল, টাওয়ার অফ সাইলেন্সে থেকে কাজ করতে হবে।

ফিরোজ এই শর্ত দু'টি মেনে নেয় এবং ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে সেপিডেকে বিয়ে করে। এই বিয়েতে ফিরোজের পিতা অনুপস্থিত থাকলেও উপস্থিত থাকে তার মা। শুরু হয় ফিরোজ আর সেপিডের নতুন দাম্পত্য জীবন।

এই উপন্যাসের কাহিনির পরিপ্রেক্ষিত ভারত বিভাগের পূর্বকাল। অর্থাৎ ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৬। খাণ্ডিয়ারা ছিল ওই সময় অনুসূচিত সম্প্রদায়। তারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন করে আন্দোলনে নেমে ছিল। মহাত্মা গান্ধী ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেন। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল তখন উত্তপ্ত। একই সালের ১৮ এবং ১৯ জুলাই নাগপুরে সর্বভারতীর অনুসূচিত জাতি সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের শেষে গঠন করা হয় সর্বভারতীয় অনুসূচিত জাতি ফেডারেশন (এআইএসসিএফসি) নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন। এই ফেডারেশনের নেতা ডক্টর আম্বেদকর তাদের নিজস্ব ভাবনা জনগণের মধ্যে তুলে ধরেন:

'The third thing we must do is not be content with mere political democracy. We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy can not last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life.'

শত শত বছর ধরে খাণ্ডিয়ারা নিম্নবর্ণ হিসাবে সমাজে নিষ্পেষিত ও পদদলিত। গর্দভের মত খাটতে খাটতে তাদের দিন অতিবাহিত হয়। পশ্চাৎপদ খাণ্ডিয়ারা তাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত মুল্য কখনো পায়নি। না পেয়েছে ঠিকমত বেতন, না পেয়েছে খাদ্যদ্রব্য, না পেয়েছে সুন্দর একটি আশ্রয়, না পেয়েছে সমাজে কোন মর্যাদা। তারা দাবি জানিয়েছিল আট ঘণ্টার কাজ, বছরে দশদিন আকস্মিক ছুটি, অতিরিক্ত কাজের জন্যে বাড়তি মজুরি। এটা ছিল একটা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল ফিরোজ আর রোস্তম। দাবি আদায়ের জন্যে কর্মবিরতি আন্দোলন করেছিল। তাদের আন্দোলন বরদাস্ত করেনি পার্সি সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল চক্র। বরং উল্টো ব্যবস্থা গ্রহণ করে শাস্তি প্রদান করা হয়। ফিরোজকে কাজ থেকে ছাঁটাই করা হয়। খাণ্ডিয়াদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে খাণ্ডিয়াসমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করার চেষ্টা চালানো হয়। এতদ্সত্ত্বেও আন্দোলনে তাদের দাবিতে তারা ছিল অটল।

ফিরোজের বৈবাহিক জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মাত্র কয়েক বছর টিকে ছিল ফিরোজ আর সেপিডের দাম্পত্য জীবন। ফরিদা নামে একটি কন্যা সন্তান জন্মের পর সর্প দংশনে মৃত্যুবরণ করে সেপিডে।

উপন্যাসটিতে সাইরাস মিস্ত্রী তুলে ধরেছেন মুম্বইয়ের ছোট পার্সি সম্প্রদায়ের তিন হাজার বছরের ঐতিহ্য এবং শবদেহ সৎকারের প্রচলিত ব্যবস্থার চিত্র। ঔপন্যাসিক আরো তুলে ধরেছেন গত শতাব্দীর নব্বই দশকের মধ্যবর্তী কালের পার্সি জনগোষ্ঠীর ভেতরে বিদ্যমান নানা প্রসঙ্গ।

উপন্যাসের ২৩৮ পৃষ্ঠায় ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন–

'...an amateur ornithologist in Bombay observed a steep decline in the population of vultures. He was immediately denounced by Zoroasthrian orthodoxy as an agent provocateur set up by the reformist faction to bring disrepute to an ancient system of corpse disposal that was immaculate in its efficiency, hygenic and moreover, ecologically sound.' (পৃ. ২৩৮)

উপন্যাসটিতে আছে একাধিক প্রেম, বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর বিবরণ। আছে ফিরোজের মায়ের কথা, আছে সেপিডের মা রুদাবেথের কথা, আছে ফিরোজের দাদা ভিসপির ভালবাসার পাত্রী শেবনওয়াজের কথা, আছে বুজ্জির, রোস্তম, জোসেফ কাঙ্গারের কথা, আছে খ্রিস্টানদের গোরস্তানে দুর্ঘটনাজনিত কারণে খাণ্ডিয়া সমকামী বুচিয়ারের কথা, আছে ফিরোজের বৃদ্ধ পিতা ফ্রেমরোজের কথা।

এই উপন্যাসে খাণ্ডিয়া সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তনের চিত্র রয়েছে। ৩৫ বছর আগে ফিরোজরা যে আন্দোলন করেছিল, সেই আন্দোলনের ফলে খাণ্ডিয়া এবং নুসসেসালারদের উত্তরসূরীরা বিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে খাণ্ডিয়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয়।

আরো পরিবর্তন ঘটেছে খাণ্ডিয়া সম্প্রদায়ের মান্ধাতার আমলের ধর্মীয় রীতিনীতি ও প্রথার। শবদেহ রাখার 'টাওয়ার অফ সাইলেন্স'-এর জমি প্রমোটরের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে এবং সেই জমিতে এখন নির্মিত হয়েছে বহুতলবিশিষ্ট আবাসন গৃহ। সেখানে এখন বাস করে বিলাসী বাবুলোকেরা।

ফিরোজ এলচিদানা যুবা থেকে প্রৌঢ় এবং প্রৌঢ় থেকে আজ বুড়ো হয়ে গেছে। অতীত স্মৃতি রোমন্থন করে দিন কাটে তার। সদা মনের মুকুরে তার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেপিডের স্মৃতি। এই উপন্যাসটির কাহিনি সেই স্মৃতিচারণ। এই উপন্যাসে সাইরাস মিস্ত্রী তুলে ধরেছেন পার্সি নববর্ষে দশদিন ধরে যে 'all soul's week' উদ্‌যাপিত হয়, সেই বিষয়টিও।

ক্রনিকাল অফ আ কর্পস বিয়ারার হল একটি ধ্রুপদী উপন্যাস। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচক অরবিন্দকৃষ্ণ মেহরোত্র মন্তব্য করেছেন: 'There is more magic in Mistry's realism than in magic realism.'

Magic realism শব্দটা ব্যবহারে আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে। কারণ কোন বাস্তবতা ঐন্দ্রজালিক হতে পারে না। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশ্রিত হতে পারে মাত্র– বাস্তব ও কল্পনা মিলেই রচিত হয় একটি উপন্যাস।

হোসেনউদ্দীন হোসেন কবি, কথাশিল্পী

Coca-Cola

খোলো খুশির জোয়ার!

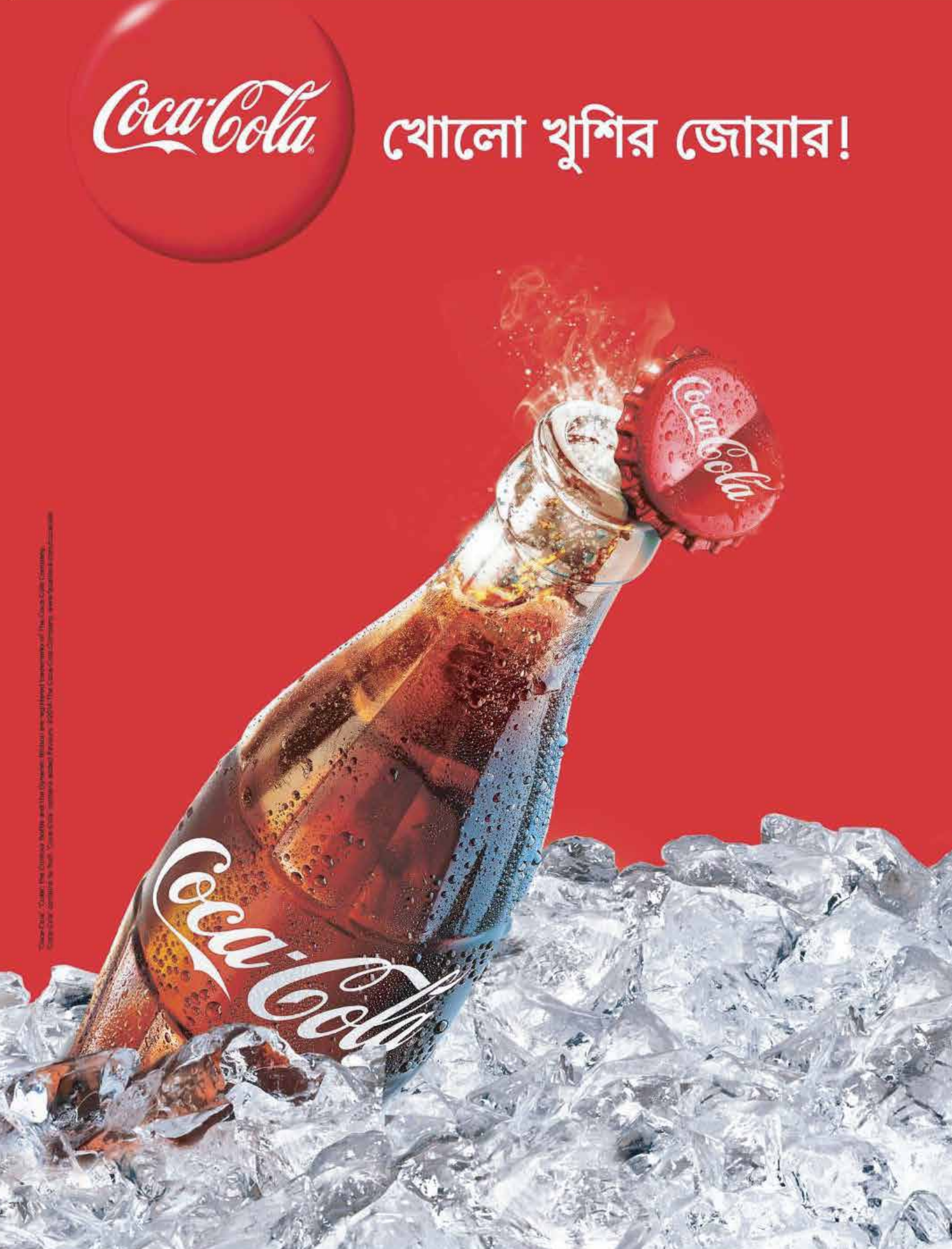

ছোটগল্প

নাকছাবি

কাজী লাবণ্য

গোধুলির শেষ আলোটুকুও নিভে গেছে। নিভে যাওয়ার পরেও যে অদ্ভুত নরম আলোয় দিকদিগন্ত মায়াময় হয়ে থাকে, তাও আর নেই। অন্ধকারে ডুবে গেছে চারপাশ। শহরের এই দক্ষিণ দিকটায় ল্যাম্পপোস্ট না থাকায় অন্ধকারেই ডুবে থাকে। এখানে ছুটন্ত গাড়ির হেডলাইট বা চাঁদের আলোই ভরসা। তবে অন্ধকারের নিজস্ব একরকম আলোর আভা আছে যাতে আস্তে আস্তে চোখ সয়ে আসে। তাছাড়া মানুষজনও এদিকে খুব একটা আসে না। এটি শহরের একেবারে শেষ সীমানা। এর পরেই শুরু হয়েছে নিচু জলাভূমি।
আর পাশেই আছে একটি ভাঙা পুরনো জমিদার বাড়ির অংশ যা গাছপালা আর সাপখোপের অভয়ারণ্য। ঝোপঝাড়, জঙ্গল, বাদুড়, চামচিকা, বিভিন্ন পাখিতে ভরা ভাঙা বাড়িটা। এদিকটায় খুব কম মানুষ আসে। সামনের রাস্তা দিয়ে শাঁ শাঁ করে গাড়ি ছুটে যায়। মাঝে মাঝে শর্টকাট করতে দু'একজন মানুষ এদিক দিয়ে চলাফেরা করে। তাছাড়া এই ভাঙা জমিদার বাড়ির ভেতরে চলে নানা রকম অসামাজিক কর্মকাণ্ড। যত চোর, সন্ত্রাসী, নেশাখোরদের আস্তানা এখানে। কাজেই পারতপক্ষে মানুষ এই দিকটা এড়িয়েই চলে।

চাকু রাসেল বসে আছে রাস্তার পাশে, রাস্তার ভাঙন রোধের জন্য যে প্রাচীর দেওয়া আছে তার উপর পা ঝুলিয়ে।
ওরা দুজন বসে ছিল, একটু আগে কানা জুয়েল উঠে গেছে ফেন্সি আনার জন্য। কানা জুয়েলের জন্য অপেক্ষা করছে চাকু রাসেল।

চাকু রাসেল সন্ত্রাসী জগতে এক জখমি নাম। চাকু চালাতে সে এতই দক্ষ আর পটু যে তার নামই হয়ে যায় চাকু রাসেল। সে এতদিন ঢাকায় ছিল। সেখানে হেন কাজ নাই রাসেল করেনি। জানোয়ারের মত দুঃসাহস, তীক্ষ্ণতা আর বিবেকবর্জিত হওয়ায় রাসেল বড় ছোট পাতি গডফাদারদের কাছে পরিচিত ছিল। কিছুটা স্নেহের আশ্রয়েও ছিল। কিন্তু কিছুদিন হয়, একটা কাজে কিছুটা বেকায়দা করার ফলে ওকে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকতে বলে দিয়েছে ওর ফাদাররা। আপাতত ও দেশের বাড়িতে এসেছে। কাজ না থাকায় বসে থাকতে থাকতে হাতে একদম টাকা-পয়সা নেই। সঞ্চয় সব শেষ।

খাওয়া-দাওয়া বাড়িতেই হচ্ছে কিন্তু আসল জিনিস কেনার পয়সা তো বাড়ি থেকে পাওয়া যায় না।

আসল জিনিস ছাড়া একদণ্ডও চলে না। ওর সাগরেদ কানা জুয়েল কিছু কিছু যোগানোর চেষ্টা করে, কিন্তু সেগুলানে পোষায় না। চাই আরো কড়া, আসল মাল– হিরুঞ্চি।

শালা হারামজাদা মুরগি খবির, মুরগি বেচাকেনার আড়ালে হেরোইনের ব্যবসা করে, আজকাল পুরো দাম ছাড়া একটা পুরিয়াও দিতে চাচ্ছে না।

অথচ আগে, মাগনায় রাসেলকে ডাইল, পুরিয়া, হিরুঞ্চি, গাঁজা, ইয়াবা এমনকি তাজা মাইয়াগুলাকে দিতে পারলে এখানকার সবাই ধন্য মনে করত নিজেকে। সবার মধ্যে প্রতিযোগিতা হত কে সেরা জিনিস রাসেলকে ডেলিভারি দিতে পারবে।

দিন পালটে গেছে। আর শালার হইছে এক মোবাইল, মুহূর্তের মধ্যে সব খবর সব জায়গামত পৌঁছে যায়। রাসেলের যে এখন দিন নাই, তা সবার জানা হয়ে গেছে। সেই সুযোগ নিচ্ছে খবির, শালার গর্দান বেড়েছে, রুলটানা খাতার মত ঘাড়ের ভাঁজ থেকে উঁকি মারে চকচকে চেইন আর ফকফকে পাউডার। দিন আসুক, গর্দানকে দেখে নেব। শালা হারামি।

রাগে-দুঃখে-হতাশায় নেশার জিনিসের অভাবে এবং আরো কিছু শারীরিক চাহিদায় রাসেল একেবারে নেড়ি কুত্তা হয়ে উঠেছে। এখানে সব ধরনের মাল পাওয়াও যায় না। ঢাকায় কত ধরনের জিনিস পাওয়া যায়। এক ইয়াবাই পাওয়া যায় তিন ধরনের। নিজ নিজ পকেট বুঝে সুবিধামত যার যারটা নিয়ে নেয়। এক নম্বর ইয়াবার রঙ হয় সবুজ বা গোলাপি। নেশা হয় ভাল, দামও বেশি। মাঝারি আছে, আবার তিন নম্বরের আছে।

তার ওপর গতকাল মার সঙ্গে হয়ে গেছে একচোট। একেবারে নিরুপায় হয়েই রাসেল বলেছিল– মা আমাকে কিছু টাকা দাও। যদিও সে জানে মার হাতে একটা ফুটো পয়সাও থাকে না, নানাভাবে, নানা সংগ্রাম করে কিভাবে কিভাবে যেন এই মহিলা সংসারটাকে ধরে রেখেছে। তারপরও একেবারে মরিয়া হয়েই সে চেয়েছিল।

মা বলেছিল– তুই কি কিছুই জানিস না, সংসার কিভাবে চলে? তোর বোনটাকে আমি কিভাবে খাওয়াচ্ছি, লেখাপড়ার খরচ জুগিয়ে যাচ্ছি, তোর বাবা বিনা চিকিৎসায় যখন চলে গেলেন, কোথায় ছিলি তুই? এতগুলো বছর আমরা খেয়ে, না-খেয়ে, বেঁচে আছি না মরে গেছি, খোঁজ নিয়েছিস? আমি সেলাই করে, এ-বাড়ি ও-বাড়ি বাচ্চা পড়িয়ে কোনরকমে দিন গুজরান করি। আর নবাবজাদা এখন আসছে টাকা চাইতে। একটা পয়সাও নাই আমার কাছে, থাকলেও আমি তোরে দিতাম না। আমি এখন জানি– আমার একটাই মেয়ে। আমার আর কোন সন্তান নাই। বিধবা মানুষ মেয়েটাকে নিয়ে আছি, মরি বাঁচি তোর কোন দায় নাই। তোর উপর আমার, আমাদের কোন দাবি নাই। তুই দূর হয়ে যা এখান থেকে। বেঈমান ছেলে, আমার ঘেন্না হয় তোর মত ছেলে পেটে ধরেছিলাম। তুই মরিস না ক্যান? তোদের কত ছেলেই তো গুলি খেয়ে, বোমা খেয়ে মরে, তুই মরিস না?

মায়ের প্যানপ্যানানি, তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ চলতেই থাকে, থামে না। যদিও এসবের কিছুই ঢোকে না রাসেলের কানে। তার চ্যাতভ্যাত কিছুই নাই। তার এখন একটাই চাওয়া, কিছু টাকা।

টাকা ছাড়া কেউই মাল দিচ্ছে না। অথচ ওই জিনিস ছাড়া ওর চলবে না। কাল সারারাত ঘুম হয়নি। শরীরে অসম্ভব যন্ত্রণা। খাওয়ায় অরুচি, গা ম্যাজ ম্যাজ, উফ্! মাল চাই, মাল।

রাসেল আবার খুব অনুরোধের সুরেই বলে– মা কিছু টাকা দাও, ধার হিসেবেই দাও, আমি পরে তোমাকে অনেক গুণ বেশি ফেরত দেব।

রাসেলের মায়ের আর সহ্য হয় না। মাথায় আগুন ধরে যায়– কুত্তার বাচ্চা, তোর টাকায় আমি লাথি মারি, থুতু দেই। আবার আমাকে অনেকগুণ বেশি দেবার লোভ দেখাস! তোর ওই নোংরা পয়সা আমি নিয়েছি কোনদিন? তুই বাইর হ, বাইর হ আমার বাড়ি থেকে।

বহু বছরের রাগ, ঘৃণা, দুঃখ, হতাশায় রাসেলের মা উন্মাদ হয়ে ওঠে। কি বলে না বলে হুঁশ থাকে না। উত্তেজনায় তার শরীর কাঁপতে থাকে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে থাকে। বুক হাপরের মত ওঠানামা করে।

হাতের কাছে একটা পাখা ছিল তাই দিয়ে মারতে যায় ছেলেকে। পিঠে একটা বাড়ি দেয়ও। আর তখন রাসেল চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকায়। এসব গালিগালাজ, পাখার মারে রাসেলের কিছুই যায় আসে না, কোন বিকারই থাকে না। কিন্তু হঠাৎ মায়ের মুখের দিকে চোখ পড়তেই রাসেলের মাথায় বিদ্যুৎ চমকে যায়। আরে, তাইতো! এটা নজরে আসেনি!

রাসেল নির্বিকারভাবে মায়ের পাখা ধরা হাতটি ধরে স্থির হয়ে বলে– মা, তোমার নাকের ওইটা দাও।

প্রথমে মাও কিছুই বোঝে না, রাসেলের চোখের দিকে চেয়ে থাকে, ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে কয়েক সেকেন্ড পর চিৎকার করে উঠে– শুয়োরের বাচ্চা, তুই বলিস কি? আমার আছে কি, এটা তোর বাপের দেওয়া সর্বশেষ চিহ্ন, হাজার বিপদেও আমি এটা আগলে রাখছি, কোনভাবেই বিক্রির কথা মনেও আনি নাই, তোর নজর এখন এখানে! এ্যা! ও আল্লাহ–

মায়ের কথা রাসেলের কানে ঢুকলে তো! রাসেল নিজের কাঙ্ক্ষিত জিনিস পেয়ে গেছে, সে আরো দু'একবার মাকে ব্যর্থ অনুরোধ করে তারপর দুর্বল মাকে এক হাতে জাপটে ধরে টান মেরে নাক থেকে খুলে নেয় ওর বাবার দেওয়া শেষ স্মৃতি মায়ের নাকের নাকছাবি।

রাসেল তো এটার নামও জানে না। ওর কাছে এটা এক টুকরো সোনা, যার বিনিময়ে ও কিছুটা হেরোইন পাবে।

স্তম্ভিত অসহায় মায়ের গলার সুর বদলে যায়। ওর মা চিৎকার করে পেছন পেছন– রাসেল বাবা ওটা নিস না, ওই নাকছাবিটা তোর বাবা আমার বিয়ের সময় দিয়েছিল । ওটা নিস না বাবা। রাসেল বাপ, আমার কথা শোন, আমি তোকে কিছু টাকা দিচ্ছি... রা-সে-ল... বা-বা...বা-বা-রে....

কিন্তু রাসেল কি আর আছে?

ততক্ষণে সে উধাও। রাসেল এসে বসে ওদের বসার আখড়ায়, সেই জমিদারবাড়ির একদম ভিতরে একটা ছোট্ট কামরা আছে যেটি এখনও অক্ষতই আছে। ওরা সবাই ওটা ঝেড়ে-মুছে নিয়েছে। ওখানেই ওরা শোয়, বসে, নানাবিধ কাজ ওখানেই হয়। রাসেল এসে দেখে কানা জুয়েল আগে থেকেই বসে আছে। রাসেল এসেই হাত বাড়িয়ে বলে– এইটা বিক্রি করে মুরগি খবিরের কাছ থেকে জিনিস লইয়া আয়।

জুয়েল বলে, আমি খবর লইছি পুলিশের তাড়া খেয়ে মুরগি আপাতত গা-ঢাকা দিছে। দু'একদিন পরে আনব। শুনে রাসেলের মাথা আবার নেতিয়ে পড়ে, থুঁতনি লেগে যায় বুকের সঙ্গে। নাকছাবিটা অতি সাবধানে পকেটে রেখে দেয়।

হঠাৎ সে সটান শুয়ে পরে। বলে একটা কিছু লইয়া আয়, আরতো পারছি না। জুয়েল পকেটে হাত দিয়ে ডাইলের বোতল বের করে দেয়, রাসেল গলায় ঢেলে আহ করে তৃপ্তির শব্দ করে। এভাবেই ওই রাত পার হয়ে যায়।

পরদিন সন্ধ্যায় রাসেল বসেছিল প্রাচীরের উপরে। জুয়েল গেছে ডাইল আনতে। রাসেল অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে।

মোবাইলে কথা হইছে– জুয়েল আসছে, কিছু ডাইলের বোতল এবং কিছু অন্য জিনিসও পাইছে।

রাসেল কিছুটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আহ! কতদিন পর! জম্পেস করে আজ জিনিস খাওয়া যাবে। সঙ্গে একটা তাজা মাল পাইলে বেশ জমত।

সেও ম্যালাদিন হয়, তাজা বা প্লাস্টিক কিছুরই গন্ধ নেওয়া হয়নি।

হঠাৎ একটু দূরে একটা অন্ধকার ছায়ামূর্তি দেখা যায়। রাসেল ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় দু'চোখের মাঝে এনে কপাল কুঁচকে তাকিয়ে থাকে–

শেষ মুহূর্তে নারীমূর্তি উঠে বসার চেষ্টা করে, হাত-পা দিয়ে ঠেকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু মহা শক্তিমান চাকু রাসেলের সাথে পেরে উঠবে কেন? ওঠার চেষ্টা করাতে রাসেল রেগে গিয়ে অকথ্য গালিগালাজ করে। কাজ সেরে উঠে চলে যায় রাসেল, যাবার সময় একবার পেছন ফিরে দেখে, মাগি আবার আঁচল দিয়ে পুরো মুখ পেঁচিয়ে ঢেকে রেখেছে। কঠিন এক বিদ্রুপের ভঙ্গি ফোটে রাসেলের ঠোঁটে। সে বিড়বিড় করে বলে, হিজাবওয়ালি আইছে! আশ্চর্য, কাজের সময় মাগী সামান্য একটু শব্দও করে নাই। কি জানি, মনে হয় না জ্ঞান ছিল।

ছায়ামূর্তিটি এগিয়ে আসছে।

রাসেল ভাবে জুয়েল আসছে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বোঝে, নাহ্ এতো কানার হাঁটা না। তাহলে কে?

এই এলাকায় খুব কম মানুষ আসে সন্ধ্যার পর।

রাসেল চমকে ওঠে– আরে, এতো মাইয়া মানুষের হাঁটা। এ সময়, এই এলাকায় মাইয়া মানুষ!

একেবারে কাছে এলে সে বুঝতে পারে হ্যাঁ, খাঁটি মাইয়া মানুষই বটে। রাসেল এই অপ্রত্যাশিত পাওয়ায় যারপরনাই খলবল করে খুশি হয়ে ওঠে। ওর জিহ্বা লালায় ভরে যায়। শরীর টানটান হয়ে উঠে। ভাবে, আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিল!

মনে পড়ল, রাতে তো ঘুম হয় না এপাশ ওপাশ করতেই যায়, সম্ভবত তখন ভোর, পাশ ফিরতে গিয়ে চোখের কোণে দেখেছিল– জায়নামাজে বসা মাকে।

মূর্তি যখন রাসেলের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, চিতা যেমন শিকারের ওপর নিঃশব্দে ঝাপিয়ে পড়ে, একেবারে আকস্মিক ও মূর্তির ঘাড়ের ওপর লাফ দিয়ে পড়ে প্রথমেই মুখ চেপে ধরে। যাতে সামান্য টু-শব্দটিও না করতে পারে।

রাস্তার পাশ থেকে একটা ব্যাঙের অন্যরকম আর্তনাদ ভেসে আসে, মনে হয় সাপ ব্যাঙ ধরেছে। এখন সে এটা ধীরে ধীরে গলাধঃকরণ করবে। মাথার ওপর দিয়ে কিছু রাতের পাখি ডানা ঝাপ্টে উড়ে যায়।

রাসেলের শক্তির কাছে ছায়ামূর্তির শক্তি কিছুই না সেটা রাসেল ভালভাবেই টের পায়। খুব সহজেই রাসেল মূর্তিকে নিয়ে ওদের আস্তানায় আসে ।

ভিতরের ছোট্ট রুমে গিয়ে এক ধাক্কায় মূর্তিকে সে বহু ব্যবহৃত শানের ওপর ফেলে দেয়।

অন্ধকারে, অনুমানে এবং স্পর্শ দিয়ে অভিজ্ঞ রাসেল বুঝতে পারে এ হচ্ছে প্লাস্টিক।

একটা কচি তাজা হলে ভাল হত। ভাবতে ভাবতে মনে করে যাক, যা পাওয়া গেছে এখন এই যথেষ্ট।

রাসেল ফোন করে কানাকে সব জানায়। সেও জিজ্ঞেস করে– উস্তাদ প্লাস্টিক না তাজা?

উত্তরে রাসেল বলে– খানকির পো জলদি আয়া পড়, দেরি সহ্য হচ্ছে না।

কানা খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে বলে– আইতাসি, তয় তোমার কিন্তু সেঞ্চুরি করতে আর অল্প বাকি...

রাসেল ধমকে উঠে, আবে হালায় সব ভুইলা গেছিস, হিসাবপত্তর জানিস? আজই চাকু রাসেলের সেঞ্চুরি হইব। পারলে আর একটা ধেনো বোতল আর কিছু খাবার আনিস। সেঞ্চুরি সেলিব্রেট করব।

ওদের জগতে কম বয়সী মেয়েরা তাজা ফুল, আর একটু বয়স হলে প্লাস্টিক। রাসেল ইতোপূর্বে নিরানব্বইটি তাজা বা প্লাস্টিক ফুলের গন্ধ শুঁকেছে, আজ হলে তার ১০০ পুরা হবে। সেটাই হবে ওর সেঞ্চুরি।

এদিকে শানের উপরে, ঝাপসা অন্ধকারে নারীমূর্তিটি একদম নড়াচড়া বন্ধ করে দিয়েছে। ধাক্কার চোটে অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি কে জানে। রাসেল এগিয়ে গিয়ে ঝাকিয়ে বলে–

ওই খানকি মইরা গেলা নাকি?

মূর্তি নড়াচড়াও করে না, কোন কথাও বলে না। চিৎকারও করে না। অনেক মাইয়া চিৎকার কইরা ফাটাইয়া ফেলায়, মজাই লাগে। অবশ্য চিৎকারেও মজা, চুপেও মজা ।

কিন্তু এ প্লাস্টিক মনে হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে। ধুর, অত ভাবার সময় নাই।

শেষ মুহূর্তে নারীমূর্তি উঠে বসার চেষ্টা করে, হাত-পা দিয়ে ঠেকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে।

কিন্তু মহা শক্তিমান চাকু রাসেলের সাথে পেরে উঠবে কেন? ওঠার চেষ্টা করাতে রাসেল রেগে গিয়ে অকথ্য গালিগালাজ করে ।

কাজ সেরে উঠে চলে যায় রাসেল, যাবার সময় একবার পেছন ফিরে দেখে, মাগি আবার আঁচল দিয়ে পুরো মুখ পেঁচিয়ে ঢেকে রেখেছে। কঠিন এক বিদ্রুপের ভঙ্গি ফোটে রাসেলের ঠোঁটে। সে বিড়বিড় করে বলে, হিজাবওয়ালি আইছে! আশ্চর্য, কাজের সময় মাগী সামান্য একটু শব্দও করে নাই। কি জানি, মনে হয় না জ্ঞান ছিল।

রাসেল চলে যায়। জুয়েলের একটা থাকার জায়গা আছে, সেখানে ওরা মাঝরাত পর্যন্ত ফুর্তি করে সেঞ্চুরি উপলক্ষে। ফোনে সবাইকে জানিয়ে দেয় সেঞ্চুরির কথা। সবাই জেনে যায়, আজ চাকু রাসেলের সেঞ্চুরি হইল।

দু'জনেই ঘুমুতে যায়।

শোয়ার পর রাসেল বলে– কানা, কাল এইটা বিক্রি কইরা পুরিয়া আনবি। পুরিয়া ছাড়া আর কিছুতেই চলছে না। কানা উত্তর দেয়, হ আনমু উস্তাদ। আজ ঘুমাও।

রাসেল পকেটে হাত দিয়ে সেই জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করার চেষ্টা করে, কিন্তু টের পায় না। সে ত্বরিত উঠে বসে ভাল করে পকেট হাতড়ায়, নাই। এ পকেট ও পকেট– নাহ কোথাও নাই।

আশ্চর্য, পকেটেই তো ছিল। ইতোপূর্বে বার বার পকেটে হাত দিয়ে সে দেখেছে যে ওটা আছে। তাছাড়া ওটা তো খুব সহজে পড়ে যাওয়ার কথা নয়।

হঠাৎ রাসেলের মনে হয়, তাহলে কি সেই সময় মন্দিরের সেই শানের ওপর পড়ে গেছে?

চিন্তা করে, হিসেব-নিকেশ করে সে শিওর হয়– হ্যাঁ ঠিক তাই হইছে। ওই সময় ওখানেই পড়েছে। এছাড়া তো পড়ার প্রশ্নই ওঠে না।

খুব দ্রুত সে কানাকে নিয়ে মন্দিরে যায়, সেই জায়গায় গিয়ে আতিপাতি করে খোঁজে– নাহ কোথাও নাই। আশ্চর্য, গেল কোথায়? পড়ল কোথায়?

রাসেল আবার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বলে ওই মাগিই ওটা নিয়ে গেছে। শালিরে, এখন পাই কই?

কাল টাকা ছাড়া তো হিরুঞ্চি পাব না।

কানা জুয়েল ওকে নানা কথা বলে শান্ত করে।

আবার ফিরে এসে ওরা ঘুমিয়ে পড়ে।

তখন পথের কুকুরগুলিও ঘুমিয়ে পড়েছে, জ্যোৎস্না বিলিয়ে ক্লান্ত চাঁদও হেলে পড়েছে। গাড়ি-ঘোড়ার শব্দও আর শোনা যায় না। রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। জগত চলে আপন নিয়মে। পৃথিবীও চলে তার কক্ষপথে একই নিয়মে, সঠিক নির্দিষ্ট গতিতে। চারপাশ নিস্তব্ধ, নিঝুম। কোথাও কোন ছন্দপতন নেই। জাগতিক নিয়মেই রাত পার হয়ে ভোর হয়। পাখিরা জেগে ওঠে। জেগে উঠতে থাকে জগত। চারিদিকে একের পর এক আজানের শব্দ ধ্বনিত হতে থাকে।

সেই পবিত্র ভোরে, কাদের যেন আর্তনাদ কানা জুয়েলের দরজায় আছড়ে পড়ে। ধাক্কাতে থাকে। অনেকগুলি উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়। একেকজন একেক কথা বলে।

অতঃপর চাকু রাসেল, কানা জুয়েলের নেশার মরণঘুম ভাঙে।

ঘুম ভাঙার পর জানতে পারে গতরাতে রাসেলের মা গলায় ফাঁস নিয়ে মারা গেছে।

রাসেলের মন বা মস্তিষ্কে কিছু কি আদৌ ঢোকে!

কানা জুয়েল রাসেলকে নিয়ে ওর বাড়িতে আসে।

বাইরের ছোট্ট উঠোনের মত জায়গায় মাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। একটা পুরনো শাড়ি দিয়ে মার শরীর আপাদমস্তক ঢাকা।

পাড়া প্রতিবেশী সবাই এসেছে, কে একজন বলল– রাসেলের ছোট বোন ঘরের ভিতরে অজ্ঞান হয়ে আছে।

রাসেল এক ঘোরের মধ্যে আছে। কি হল, মা এমন কেন করল!

জন্মের পর থেকেই রাসেল দেখেছে আজন্ম এক সংগ্রামী মাকে, কোন দিন ভেঙে পড়েনি, সংসারটাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে, দুই ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে সারাজীবন টুকটুক করে শব্দহীন লড়াই করে গেছে। কি এমন হল যে মাকে আত্মহত্যা করতে হল!

তাহলে কি নাকছাবিটা নেওয়াতে মা এমন করল?

আশ্চর্য, তা কি করে হয়! হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ আঘাত, দুঃখ, অপমান হজম করা মা, একটা নাকছাবির জন্য এমন করবে!

কোন হিসেব মেলাতে পারে না রাসেল। এই ঘটনা মায়ের চরিত্রের সাথে ঠিক যায় না।

উপস্থিত কে একজন বলল, এই রাসেলকে ওর মায়ের মুখটা দেখিয়ে দাও।

পাশের বাসার এক চাচী এসে রাসেলের হাত ধরে মায়ের কাছে এনে বসিয়ে দেয়। আর একজন মায়ের মুখের কাপড় তুলতে থাকে। রাসেলের কেমন যেন ভয় করে। ওর ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে যায়।

দরিদ্র বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান ও। বাবা-মা খুব আদর করতেন। ওতো আর নেশাখোর বা সন্ত্রাসী হয়েই জন্ম নেয়নি। ছোটবেলাটা আর দশজনের মতই স্বাভাবিক ছিল, বলা চলে– ভালই ছিল ।

চাচী বলে উঠলে– বাবা মায়ের মুখ শেষবারের মত দেখে নাও, শুনে সম্বিত ফিরতেই রাসেলের চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। ওর পায়ের নিচে ভূমিকম্প হয়।

একি! এটা কি! মায়ের মুখের ঠিক মাঝখানে ওটা কি? ওটা কোথা থেকে মায়ের কাছে এল? রাসেলের মাথায় ঝড়ের গতিতে হিসেব চলে... ওটা তো কাল মন্দিরের শানের উপর... তাহলে সেই নারীমূর্তি কি...

সেজন্যেই কি সেই নারীমূর্তি আঁচল দিয়ে মুখ পেঁচিয়ে রেখেছিল!

সেজন্যেই কি সে একটুও শব্দ করেনি! তাছাড়া এখন মনে হচ্ছে একটা অতি পরিচিত জর্দার গন্ধও নাকে লেগেছিল। এখন রাসেল নিজের সকল ইন্দ্রিয় বিচারে বুঝতে পারে– কালকের নারীমূর্তি কে ছিল।

মায়ের নাকে চিরদিনের, বাবার স্মৃতিচিহ্ন নাকছাবিটা জ্বলজ্বল করছে।

রাসেল জীবনে বহু বার, বহু জায়গায় নানা রকম বোমা ছুঁড়েছে, এগুলোর বিস্ফোরণ দেখেছে, কিন্তু আজ রাসেলের মাথার ঠিক মাঝখানে, কেন্দ্রবিন্দুতে এক শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণ ঘটে।

সন্ত্রাসী, নেশাখোর, লম্পট রাসেল জীবনে অনেকবার অনেকরকম নৃশংসতা, বীভৎসতা ও ভয়াবহতার মুখোমুখি হয়েছে, সে-সব অবলীলায় হজমও করেছে। কিন্তু আজ সে সহ্য করতে পারল না। এটা হজম করার ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরও ওকে দেয়নি।

দুই হাতে নিজের মাথার চুল খামচে ধরে সে তীর বেগে ছুটতে থাকে। রাতের বেলায় কানা জুয়েল চাকু রাসেলের লাশ আবিষ্কার করে মন্দিরের ভিতরে। নিজের সেই কুখ্যাত চাকু দিয়ে সে নিজের কব্জির রগ কাটতে গিয়ে, বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থায় অতি ধারালো চাকু দিয়ে নিজের কব্জিটাই আলাদা করে ফেলেছিল।

কাজী লাবণ্য
কবি, ছোটগল্পকার

বাংলাদেশ-ভারত
মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd
b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ABSSI
Association of Bangladeshi
Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

উড়োমেঘ

হাসান হাবিব

এতদিন হয়তো মীরাদের উড়ে যাওয়া
চিঠিটা ফেরত পাবে,
মীরা জানত শীতের তালিকাটি
দেওয়া ছিল তার–
উষ্ণ শরীর তার সে-রকম যায় না;
সে হয়তো শীতের শরীরটা বোঝে
অবিনাশী গ্রীবায় ঠোঁট রেখে গেলে
জন্ম হয় ক্ষত, শৈশব,বিষণ্ন দেশ
লুকানো স্মৃতি
মীরার বর্ণে সাজানো;
এক মহুয়া দুই হয়ে ফিরে যায়
ঝিনুক নক্ষত্রে...

শুধায় বিষ...উড়োযৌবন
সেই নগ্ন নাভি
একটা দৃশ্য হবে

মীরা জানত, তার হবে
লুকানো ঠোঁট, গাঢ় চুম্বন
যদিও পুরুষের নির্মাণ
শুধু ঘাস শুধু বৃক্ষে

অবিরত বর্ণ সাজায় মীরার চোখ
আর বেড়ে যায় বৃক্ষের বিন্যাস..

হিম আগুন

জহিরুল মামুন

তোমাকে ভালবাসি বলেই
কামারশালায় দাঁড়িয়ে থেকেছি
দিনের পর দিন
স্বর্ণকারের কাছে গিয়ে দেখেছি
অলঙ্কার বানানোর দৃশ্য।
পাঠশালার পণ্ডিতমশাইয়ের মত
মনকে বলেছি বহুবার–
'প্রেম করার আগে অপেক্ষা করতে শেখো;
ওড়াতে শেখো তোমার যৌবনের পাল।'

অপেক্ষা করতে করতে
উপেক্ষিত এ জনম
অথচ আমি এখন পরিপূর্ণ প্রেমিক এক
ভূপৃষ্ঠের মত।

মাঝরাতে ঢেঁকির শব্দ

শেলী সেনগুপ্তা

শীতের মাঝরাতে ঢেঁকির শব্দও
ম্লান হয়ে যায়
প্রোষিতভর্তৃকার দীর্ঘশ্বাসের কাছে,
শুকনো পাতায় পড়া শিশিরের শব্দেও
চমকে উঠে
বাঁহাতে আচঁল টানে মাথায়,
দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে ওঠা নথও
প্রদীপের আলোতে ঝলসে ওঠে
বিগতযৌবনার চমকে দেওয়া রূপের মত,

পরশির নিমন্ত্রণ আর ইশারায়
এঁদো পুকুরে গা ধুতে যাওয়া অবেলায়
ঢেঁকির পার পরে বুকের ভেতরে ...
দৃশ্যপট বদলে যায় ॥

বন্য সোহাগ

নীহার মোশারফ

এক জীবনে মানুষের চাওয়া-পাওয়া কতটুকু থাকে?
আন্দাজ করা যায়?
যদি ভাবনায় স্বপ্ন থাকে
খোলা আকাশে থাকে চোখ
আর কী চাই, অর্থকড়ি?
কারো কারো অর্থের মোহে ডাহুকের ডাক অসহ্য লাগে
হরিণীর হাঁটাচলা, খরস্রোতা নদীর ঢেউ, বসন্তের কৃষ্ণচূড়া
সবই কেমন ম্লান হয়ে যায়
যেখানে ভালবাসা সবেগে চলে
সম্মান দাঁড়িয়ে থাকে মাথা উঁচু করে
সেখানে খুব বেশি প্রয়োজন
একশো বিঘে জমির?
এখানে জন্মভূমি, কৃষকের চাষবাস, বাউলের গান
অমূল্যসমান
সকালের পান্তা, কাঁচা লংকার স্বাদে
উবে যায় কষ্ট
চাঁদের জ্যোৎস্না ধরে দম্পতি মিলে
তুচ্ছ রাগ-অনুরাগে সময় গড়ায়
নোনতা স্বাদে গড়ায় হলদে মোহর
কত প্রেম, মায়াবতী আসে
সন্ধের হাওয়া লাগে বুকে
পায়ের নূপুর বাজে... থেকে থেকে জেগে ওঠে
বন্য সোহাগ
রাত হয়, আঁধারে লজ্জা বাড়ে
গল্পের সুতো কাটে মোহে
এ আমার নন্দিত কথামালা
অমোঘ বন্ধন।

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায়

কবে কখন কীভাবে যে বসন্ত এসেছিল জীবনে, মনে নেই।
শুধু মনে আছে, মায়ের কোল জড়িয়ে ঘুম ভাঙতেই
হঠাৎ একদিন কোকিল ডেকে উঠেছিল।
কোলের ভাইটি সদ্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে তখন।
কি এক অজানা আশঙ্কায় ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়েছিলুম।
তারপর থেকে খুব সাবধানে, ওর পিঠ জড়িয়ে, শক্ত করে হাত ধরে
স্কুলে নিয়ে যেতুম।
হ্যাঁ, এভাবেই বসন্ত এল–
কোকিলের ডাক আর এক অজানা ভয় নিয়ে;
প্রিয়জনের হারিয়ে যাবার ভয়।

তখন বসন্তে একটা হাওয়া দিত।
বেশ টের পেতুম,
সকালবেলার মন-ভাল-করা হাওয়াটা
বিকেল হলেই কেমন পালটে গিয়ে মন-খারাপ-করা হাওয়া হয়ে যেত।
নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালে কাঁচা আমের গন্ধ, আরো কী কী সব গন্ধ পেতুম।
গুন গুন করে গান আসত– আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে।
মনের মধ্যে, আকাশে, বাতাসে, গাছের পাতায়,
ঘাসে কি যে এক আন্দোলন শুরু হত
সে কী, সে যে কী কিছু বুঝে ওঠার আগেই
আবার সুর এসে পড়ত– এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী।
আর সত্যি সত্যি নদীর জল ছলছল করে উঠত।
দু'একটি ঝরা পাতা উড়ে এসে ছুঁয়ে দিয়ে যেত।
নদীর ওপার থেকে মনকেমনের বাঁশির সুর ভেসে ভেসে আসত।
আমি মনে করার চেষ্টা করতুম– কোথায় যেন যেতে হবে
কোথায় যেন যাবার আছে...

সেদিন প্রথম রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখলুম, চাঁদের আলোয় বন্যা এসেছে।
থইথই চাঁদের আলো আমার বিছানা জুড়ে।
সেই আলোয় হাত বুলাচ্ছেন আমার পরমাসুন্দরী মা।
তাঁর দুইগাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে মুক্তোর মত চোখের জল।
তিনি গাইছেন– নিবিড় অমা-তিমির হতে বাহির হল জোয়ার স্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী...

সেদিন রাত্রে আমার সুখ আর দুঃখ মিলেমিশে গেল
আমার আলো আর আলো রইল না
অন্ধকার অন্ধকার রইল না
যা রইল, তা নিটোল এক ছবি

সে ছবির ক্যানভাস রবিঠাকুর
আর রঙ আমার মা...
তুলি হাতে আজও এঁকে চলেছি
যেদিন সম্পূর্ণ হবে, সেদিনই আমার শেষ বসন্ত।

অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায় ভারতের কবি

পথটা দুভাগ হবে

জুনান নাশিত

হতেও তো পারে দুপুরটা মিলবে না বিকেলের গায়ে
পথটা দু'ভাগ হবে তুমি চলে যাবে ডানে আর আমি বাঁয়ে
খোলসটা উড়বে কেবল ভাঙা ফ্রেম অলৌকিক বনে
তুমি ফিরবে কি ফিরবে না আমি কি জানতে চাবো
জনে জনে?
ইচ্ছে হলে এস ফেলে রেখে রাশি রাশি স্তব
আমি যে তখন থাকব না ধুয়ে মুছে তুলে রেখো
আমাদের সম্পর্কের শব।

যৌবন

জাফরুল আহসান

বহু পথ ঘুরে বহু ক্রোশ হেঁটে এসে
আমার যৌবন তোমাকে দিয়েছি আয়েসে
দীর্ঘ সময় আমানত রাখা এ যৌবন
তোমার লকারে থাক গহনা থাকে যেমন।

ফ্যাকাসে কিংবা তামাটে ধূসর নয়
কোথাও কখনো হয়নি যে অপচয়
পূর্ণ যৌবন বলা যায় তারে আনকোরা
ঝকঝকে তকতকে সে তো মখমলে মোড়া।

তোমার গভীরে যৌবন কতটা নিরাপদ
বিপদ মুক্ত কতটা, কতটা স্বচ্ছ চাঁদ
সে কথা জেনেছি তোমার উষ্ণ আলিঙ্গনে
তারপরও না-বলা কথা থাক নির্জনে।

নগ্ন হাতের কোমল স্পর্শে রাখা যৌবন
উল্টে পাল্টে খেলতেই পারো হে স্বজন
আমিতো ভাবিনি নিজেকে নিঃস্ব কখন
শত অহঙ্কার তোমাকে দিয়েছি আমার যৌবন।

এ বাতাস বৈরি বাতাস

শিহাব শাহরিয়ার

সন্ন্যাসীর লাল রঙ চুরি করে
আমি ভেসে বেড়াই তামাটে পুরুষ
এ বাতাস ধুলোমাখা বৈরি বাতাস
বাতাসের খাবি খেয়ে আমি ধরে রাখি সনাতন রশি
রশির পুরনো পাটগুলো খসে গেলে
তোমার চুলের রঙগুলোও সাদা সোনালি হয়
তুমি বুড়ি হওয়ার মাপকাঠি খোঁজো
আমাদের বালিশের নিচে সমান্তরাল চলেছিল ইঁদুর
রাতের ঘুম ভেঙে কেউ কেউ সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিল
একটি জ্যোৎস্নামাখা কৃষ্ণরাত আমাদের বগলতলায়
শুয়ে থাকে

শিশুতীর্থ

বিগফুট কি সত্যিই আছে?

নাসরীন মুস্তাফা

হিম মানব

আমার নাম শিনু। আমার বয়স যখন তিন, তখনকার কথা বলছি।

আমি তখন নেপালে থাকতাম। আম্মু নেপালে চাকরি করতে গিয়েছিলেন তো, তাই। আমার বড় বোন লিথি, মানে আমার বুনু তখন মাত্র আট বছরের বাচ্চা। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর বাংলামুখি মার্গ-এর চারতলা বাড়ির তিনতলায় থাকতাম আমরা। নিচতলায় ছিল অনুছা আর নিছা নামের দুই বোন। অনুছা আমার বুনুর চেয়ে একটু ছোট। নিছা আবার আমার চেয়ে একটু ছোট। তাতে কি, আমরা চারজন খুব বন্ধু হয়েছিলাম। অনেক মজা করতাম। খেলতাম। গল্প করতাম। হুহ্ হু, আমি আর বুনু দিব্যি নেপালি ভাষায় কথা বলতে শিখে গেলাম। সত্যি বলছি, আমরা চারজন তখন নেপালিতেই বকবক করতাম।

একদিন অনুছা ফিসফিস করে বলল, তাপা'ইম হিম মানবকে ছা থাহা ছ?

অনুছা কি বলেছিল জান? ও প্রশ্ন করেছিল, তুমি কি হিম মানবকে চেন?

হিম মানব? সেটা আবার কি? ঐ প্রথম শুনেছিলাম নামটা। কে হিম মানব? কোন লোক বুঝি? কি করে? ক্রিকেট খেলে না বাস্কেটবল? আমার বুনু কিন্তু খুব ভাল বাস্কেটবল খেলতে পারে। হিম মানব কি পারবে বুনুর সাথে?

অনুছা চোখ বড় বড় করে দম নিল। বলল, হিম মানব তোমার বোনের সাথে বাস্কেটবল খেলবে না।

কেন খেলবে না? একশো বার খেলবে। আমি খুব রাগ নিয়ে বললাম, কিনা উমালে খেলনা হুনেছা ছায়না? উমালে সায়া পাল্টা খেলনা হুনেছা। হু!!

অনুছা যেন খুব ভয় পেয়েছে। মুখ শুকনো করে বলল, হিম মানব আপনো বহিনি খানা হুনেছা।

বলে কি অনুছা! হিম মানব নাকি আমার বুনুকে খেয়ে ফেলবে। কেন?

অনুছা এরপর আমাকে যা বলেছিল, তা আমি হুবহু তোমাদের বলছি। তবেই বুঝবে, হিম মানবের কথা বলতে অনুছা অত ভয় কেন পাচ্ছিল।

হিম মানব একটা দৈত্য। হিমালয়ের সাদা সাদা বরফ ঢাকা পাহাড়ের এমন কিছু জায়গা আছে, যেখানে মানুষ সহজে যেতে পারে না। হিম মানব ওরকম জায়গাতেই বাস করে। হিমালয়ের পাহাড় ঘিরে বাস করে নেপালি শেরপা গোত্রের মানুষরা। এরা খুব সাহসী। দুদ্দাড় করে পাহাড়-পর্বতের চূড়ায় উঠে যায়। এই শেরপারা অনেক বার এদের দেখেছে। গায়ের রং সাদা। আকাশ সমান লম্বা। সাদা বরফের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে আলাদা করে দেখা যায় না। হঠাৎ করে সামনে চলে আসে। আর এসেই যাকে সামনে পায়, তার ঘাড় মটকে দেয়।

অনুছা ওর ডান কানের লতি ছুঁয়ে শপথ করে বলল, হিম মানব আপনো বহিনি খানা হুনেছা। ম' সত্য বাতাওনা ছু।

হিম মানব আমার বোনকে সামনে পেলে সত্যিই নাকি খেয়ে ফেলবে। অনুছা কানের লতি ছুঁয়ে কখনো মিথ্যে বলে না।

রাতের বেলায় আম্মুর কাছে শুয়ে গল্প না শুনলে আমার কখনোই ঘুম আসে না। কাঠমাণ্ডুর শীতে সবাই থরথর করে কাঁপে। সন্ধ্যা ছ'টা বাজতে না বাজতেই কম্বলের তলায় ঢুকে ঘুম দেয়। আর এ জন্য নেপালিরা বিকেল পাঁচটার দিকে রাতের খাবার সেরে নেয়। আমার বাপু অত তাড়াতাড়ি ঘুমাতে ভাল লাগে না। জেগে থাকলে আমার ঠাণ্ডা লাগবে (প্রায়ই লেগে যেত দুষ্টু ঠাণ্ডাটা) বলে আম্মু কম্বলের তলায় টেনে নিয়ে যেতেন। ভয় দেখিয়ে বলতেন, একটা নাকি শীতবুড়ি আছে। ছোট বাচ্চাদের পেলেই হাম্ করে ধরে নিয়ে যায়। রাতের বেলায় শীতবুড়ি ঘুরে বেড়ায়। ছোট বাচ্চাদের হাম্ করে ধরে নিয়ে যাবে বলে।

আমি ঘুমাতে চাইতাম না। কিন্তু শীতবুড়ির ভয়ে কম্বলের ভেতর ঢুকতাম। আম্মুকে জড়িয়ে ধরে থাকতাম। এখন আমার বয়স নয়। এখন আমি জেনে গেছি, আম্মু মিছেমিছি শীতবুড়ির কথা বলে আমাকে ভয় দেখাতেন। শীতবুড়ি বলে কেউ নেই। যেমন, ভুত বলে কিছু নেই।

আমার বয়স যখন সাড়ে চার বছর, তখন আমরা আমরা দুবাই গিয়েছিলাম। ওখানে খুব গরম। তখন আম্মুটা কি বলতে শুরু করল, জান? এখানে নাকি একটা গরমবুড়ি আছে! সে নাকি ছোট বাচ্চা পেলেই কাবাব বানিয়ে খায়। কিভাবে কাবাব বানায়? হাম্ করে!

আমার আম্মুটাকে নিয়ে আমি যে কী করব!

যা বলছিলাম। রাতের বেলায় আম্মুর কাছে শুয়ে গল্প না শুনলে আমার কখনোই ঘুম আসে না। কাঠমাণ্ডুর সেই দিনগুলোতেও আসত না। অনুছার কাছ থেকে হিম মানবের কথা শুনে আমি তো ভয়ে অস্থির। তাই আম্মু না ডাকতেই চলে গেলাম বিছানায়। আম্মুর গলা জড়িয়ে ধরে জানতে চাইলাম, শীতবুড়ি কি হিম মানব, মাম্মা?

আম্মু আমার দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে বললেন, আমার বেবিটা দেখি ইয়েতিকে চিনে গেছে!

আমি ইয়েতির কথা শুনিনি, হিম মানবের কথা শুনেছি। আম্মু বললেন, নেপালি ভাষায় হিম মানব তিব্বতের ভাষায় ইয়েতি। ইয়ে বা ইয়া মানে পাহাড়ি জায়গা। তি, তে, তেহ্ এসেছে তিব্বতি 'ত্রেহ' থেকে, যার অর্থ ভল্লুক। সব মিলিয়ে ইয়েতি। আসলে একটা দৈত্য। হাউ মাউ খাউ করে চান্স পেলেই হাম্ করে খেয়ে নেবে।

আমি চিনলাম হিম মানব ওরফে ইয়েতিকে। হাম্ করে খেয়ে নেবে! তাহলে শীতবুড়িই কি ইয়েতি?

নাহ্!

আম্মু বললেন, হিমালয়ের দুর্গম পাহাড়-পর্বতে ইয়েতিরা থাকে এমন অনেকেই বলে। এরা মানুষের মত দুই হাত, দুই পা-ওয়ালা। সারা গায়ে ঘন লম্বা লম্বা লোম। শীত কম লাগার জন্যই বুঝি এত লোম এদের শরীরে। মানুষের মত দেখতে হলেও এরা মানুষ নয়। শিম্পাঞ্জি, গরিলা কিংবা ভল্লুক জাতীয় কিছু হয়তো। আসলে, এদের সম্বন্ধে গল্পই আছে। আসল সত্য জানা নেই খুব একটা। সত্যিই ওদেরকে কেউ কখনো দেখেছে কি না, কে জানে?

আমি অনুছার মত চোখ বড় বড় করে ফিসফিস করে বলি, ওদেরকে কেউ না দেখলে কিভাবে জানা গেল, ওদের মানুষের মত হাত-পা আছে? সারা গায়ে লোম?

আম্মুও ভাবনায় পড়লেন আমার কথায়। ইয়েতিকে কেউ নাকি দেখেনি। অথচ মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল ওদের চেহারার বর্ণনা। কেউ না দেখলে এমন কি হতে পারে?

ইয়েতি

স্কুল থেকে ফিরে বুনু বলল, ইয়েতি আছে। আমি খোঁজ পেয়েছি।

সত্যি!!

আমি তো খুব অবাক। তখন বুনু বলল, ওদের স্কুলের লাইব্রেরিতে ইয়েতির উপর মোটাসোটা একখান বই খুঁজে পেয়েছে ও। ব্যাগ থেকে বের করল বইটা। বুনু বলল, দ্য অকওয়ার্ড ইয়েতি। ছোটদের জন্য ইয়েতিকে নিয়ে লেখা।

আমি তখনো খুব বেশি ইংরেজি জানি না। বইটা নেড়েচেড়ে দেখেই আমার মন খুশিতে ভরে উঠল। ইয়েতির ছবি আঁকা বইয়ের কভারে। চোখে চশমা, গলার কাছে বো-টাই। মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, বেচারা ভয়ে কাঁপছে।

ভয় কেন?

বুনু বলল, মানুষের ভয়ে।

বুনুর জন্যেই বইটা থেকে অনেক কিছু জেনে গেলাম আমি। আম্মুকে বললাম, ইয়েতি শব্দের সত্যিকারের মানে আমি জানি। তিব্বতি ভাষার শব্দ ইয়েতির সত্যিকারের মানে হচ্ছে 'জাদুর প্রাণী'। আর জান, ও মোটেও হাম্ করে খেয়ে নেয় না। খুব লাজুক। অনেক জোরে আওয়াজ করতে পারে। তাই বলে, ওর নামে ওরকম বাজে কথা বলা কি ঠিক হয়েছে?

বুনু মন খারাপের ভাব করে বলল, গত ছয়হাজার বছর ধরেই তো বেচারাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। এর বেশির ভাগই ভাল কথা নয়। ওরা দৈত্য। ওরা ভয়ংকর। কেউ কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি ওরা সত্যিই ভয়ংকর কি না।

আম্মু আমাদের পাত্তা না দিয়ে বলেন, ওরা যে সত্যিই আছে, তার প্রমাণ কি? সেটাও তো কেউ দিতে পারেনি।

আমরা দুই বোন একসাথে হামলে পড়ি আম্মুর উপর। বলি, তুমি জান না! অনেক প্রমাণ আছে। ওরা ছিল।

ওরা আছে।

তার মানে? আম্মু প্রশ্ন করেন, দৈত্য তাহলে ছিল?

ছিল।

দৈত্য আছে?

আছে।

কিন্তু, আমি তো জানি দৈত্য বলে কিছু নেই।

তুমি ভুল জান।

প্রমাণ দাও বাচ্চারা, আম্মু সত্যিই ভুল জানে।

আম্মু এভাবেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন আমাদের দিকে। সেই থেকে আমরাও উঠে-পড়ে লাগলাম। ইয়েতি বা হিম মানব বা দৈত্য যে-ই হোক, সে যদি থাকে,

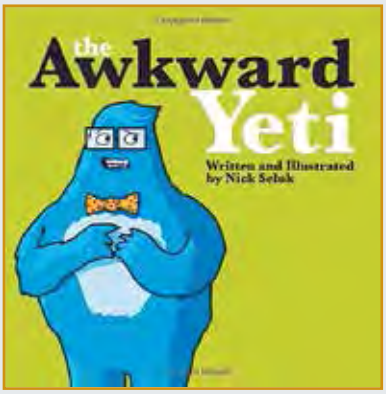

দোলকার শেরপা ইয়েতি দেখেছিলেন, এটা আম্মু মোটেও বিশ্বাস করেননি। হিমালয়ের অনেক উঁচুতে ওঠার পর ঠাণ্ডায় নাকি হাত-পা জমতে থাকে, অক্সিজেনের অভাব হতে থাকে বলে মানুষের বুদ্ধিও গুলিয়ে যায়। চোখের সামনে অনেক কিছু দেখে বলে বিশ্বাস করে, আসলে সে-সব কিছুই সে দেখে না। তার মস্তিষ্ক দেখায় আর বিশ্বাস করায় যে সে দেখছে।

তাহলেই বোঝা যাবে আম্মু সত্যিই ভুল জানে।

ইয়েতিরা রাত জাগে। শিষ দেয়, গর্জন করে। বিশাল বিশাল পাথর মাটি থেকে তুলে ছুঁড়ে মেরে খাবার সংগ্রহ করে। এক ঘুষিতে মেরে ফেলতে পারে যে কাউকে। আক্রমণ করার সময় বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। অন্য প্রাণীদের বারোটা বাজালেও মানুষকে কিছু বলে না। বরং সুযোগ পেলে মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে।

এত সব কথা যিনি বলছিলেন, তিনি একজন শেরপা। দোলকার শেরপা তার নাম।

আমি জানি, এই শেরপারা কারা। হিমালয়ের অনেক উঁচুতে থাকে শেরপা নামের আদিবাসী মানুষেরা। অনেক উঁচু মানে অনেক উঁচু, মাটি থেকে চার হাজার ফুট উপরে!

তিব্বতী ভাষার শব্দ শার মানে পূর্বদেশীয় আর পা মানে মানুষ। শারপা থেকে শেরপা। পূর্বদেশীয় মানুষ।

আম্মুর সাথে পেম্বা দর্জি শেরপার খাতির আছে। পেম্বা দর্জি শেরপা অনেক বার এভারেস্টের চূড়ায় উঠেছেন। তিনি বিয়েও করেছেন এভারেস্টের চূড়ায়। পেম্বা আংকেলকে আম্মু বলেছিলেন ইয়েতিদের নিয়ে আমাদের ভাবনার কথা। পেম্বা আংকেলই নিয়ে এসেছেন দোলকার শেরপাকে। বুড়ো মানুষ, মুখের চামড়ায় নানা রকমের আঁকিবুকি। ফিসফিস করে কথা বলেন। বারো বছর বয়স থেকে এভারেস্ট জয় করছেন। যেসব বিদেশি চূড়ায় উঠতে চান, তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। বেশির ভাগ শেরপার মত এটাই তাঁর পেশা। এই কাজটা তিনি করছেন গত আশি বছর ধরে।

বুনু হিসেব কষে আমাকে কানে কানে জানাল, দোলকার শেরপা কম করে হলেও বিরানব্বই বছর বয়সী।

দোলকার শেরপা এক গাল হেসে নেপালিতে বললেন, ম শ' দস্ বরসা পুরানা হ।

দোলকার শেরপা বলছেন, তিনি নাকি একশো দশ বছর ধরে বেঁচে আছেন। আমি তখনো হিসেবটা বুঝতে পারিনি। এক গাল হাসির ফলে দোলকার শেরপার কালো কুচকুচে দাঁতগুলো দেখতে পেয়েছিলাম। দাঁত অত কালো কেন, আমি আসলে তা-ই ভাবছিলাম।

দোলকার শেরপা বললেন, ১৯৩৮ সালের কথা। আমি তখন তেত্রিশ বছরের যুবক। এক দৌড়ে এভারেস্টের মাথায় উঠে যেতে পারি। সেই আমি সেবার ভয়ানক বিপদে পড়েছিলাম। বরফের এক বিশাল চাঁই এসে পড়েছিল আমাদের উপর। মোট পনেরজন অভিযাত্রী চাপা পড়ে গেল। আমি জ্ঞান হারানোর আগে ভেবেছিলাম, মারা যাচ্ছি। কিন্তু, আমি কি মারা গেছি? বল তোমরা?

না। আমরা দুই বোন মাথা নাড়ি।

কে আমাকে বাঁচাল?

কে? আমরা দুই বোন চোখ বড় বড় করে তাকাই বুড়ো মানুষটার দিকে।

কং আদমি।

পেম্বা আংকল বললেন, ইয়েতিদের হিমালয়ের অনেক জায়গায় কং আদমিও বলা হয়। এর অর্থ হিম মানব। স্নোম্যান।

দোলকার শেরপা জানালো, ১৯৩৮ সালে বরফের নিচ থেকে তাকেসহ আরো আরেকজন অভিযাত্রীকে টেনে বের করেছিল একটা ইয়েতি। জ্ঞান ফিরে আসার পর দোলকার দেখলেন, এক মাথা বড় বড় বাদামি চুলওয়ালা একটা কং আদমি তাদের কাছেই ঘোরাফেরা করছে। বরফের নিচ থেকে বের করতে চাইছিল মানুষগুলোকে। দোলকারের মত বরফ থেকে বের করে আনা আরেক অভিযাত্রী ভয়ে চিৎকার শুরু করেছে। সেই চিৎকার শুনে মানুষরা ছুটে আসছিল। তখন ইয়েতিটা পালিয়ে যায়।

আম্মু খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন দোলকার শেরপার কথা। এক সময় ভ্রু কুঁচকে ফেললেন। তখন দোলকার ডান কানের লতি ছুঁয়ে তাকান আমাদের দিকে। এর অর্থ, উনি মোটেও মিথ্যে বলছেন না।

দোলকার শেরপা ইয়েতি দেখেছিলেন, এটা আম্মু মোটেও বিশ্বাস করেননি। হিমালয়ের অনেক উঁচুতে ওঠার পর ঠাণ্ডায় নাকি হাত-পা জমতে থাকে, অক্সিজেনের অভাব হতে থাকে বলে মানুষের বুদ্ধিও গুলিয়ে যায়। চোখের সামনে অনেক কিছু দেখে বলে বিশ্বাস করে, আসলে সে-সব কিছুই সে দেখে না। তার মস্তিষ্ক দেখায় আর বিশ্বাস করায় যে সে দেখছে।

পেম্বা আংকেল বলেছিলেন, শেরপাদের বিশ্বাস ইয়েতি আছে। অনেক শেরপা বরফের ওপর ইয়েতির বিশাল পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছেন। অনেকে ছবিও তুলেছেন। শুধু শেরপারা কেন? ১৯২৫ সালে এক জার্মান ফটোগ্রাফার ইয়েতির ছবি তুলেছিলেন। সেই ছবি দেখে বিজ্ঞানীরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। চেনাজানা কোন প্রাণীর পায়ের ছাপের সাথে মিল খুঁজে পাননি।

আম্মু হাই তুলছিলেন। দোলকার শেরপা আম্মুর দিকে ঝুঁকে বললেন, তাপামে তেনজিং নরগে শেরপা কো নামা শুন্না গারছান?

আম্মুর হয়ে জবাব দিল বুনু। বলল, হো। ম সুনে।

সবার প্রথমে এভারেস্ট জয় করেছিলেন স্যার এডমন্ড হিলারি আর তেনজিং নরগে শেরপা। এ কথা আম্মু জানেন, বুনু জানে, আমিও জানি। ১৯৫৩ সালের সেই ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিলেন দোলকার শেরপা। স্যার হিলারি আর তেনজিং বরফের উপর পড়ে থাকা চুল কুড়িয়ে এনেছিলেন। এ চুল কার? বিশেষজ্ঞরা অনেক পরীক্ষা করেও সঠিক জবাব দিতে পারেননি। পারবেন কিভাবে? কোন চেনাজানা প্রাণীর চুলের সাথে মিল নেই যে!

আম্মু কাঠ কাঠ গলায় বললেন, স্যার এডমন্ড হিলারি তো একবারও বলেননি, তিনি ইয়েতি বা ইয়েতির মত কোন প্রাণী দেখেছেন।

দোলকার উদাস হয়ে জানায়, তিনি দেখতে পাননি তাই বলেননি।

আম্মু পাল্টা প্রশ্ন করেন, কেন দেখতে পাননি? থাকলে তো ঠিকই দেখতেন।

দোলকার হাই তুলতে তুলতে বলে, কপাল খারাপ থাকলে ইয়েতি দেখা যায় না। সাহেব অভাগী থিও।

দোলকার বলছেন, স্যার এডমন্ড হিলারি অভাগা ছিলেন, তাঁর কপাল খারাপ ছিল বলে ইয়েতির দেখা পাননি।

আম্মু হেসে ফেললেন। স্যার এডমন্ড হিলারি অভাগা ছিলেন, এ কথা শুনলে হাসি না এসে পারে?

পেম্বা দর্জি শেরপা আংকেল কিন্তু হাসলেন না। শেরপাদের একটি

লোককাহিনি শোনালেন আমাদের। লোককাহিনিতে বলা আছে, কেন ইয়েতিদের দেখতে পায় না মানুষ।

অনেক অনেক দিন আগের কথা। এক সময় ইয়েতিরা পাহাড়ের অত উঁচুতে থাকত না। মানুষের বসতি থেকে একটু উপরেই পাহাড়ের গুহায় বাস ছিল ওদের। পাহাড়ের ঢালে জুম চাষ করত মানুষ। ইয়েতিরা চুপ করে দেখত আর অপেক্ষা করত। অপেক্ষা কিসের? কখন ফসল ফলবে। ফসল ফললেই রাতের আঁধারে নেমে আসত ইয়েতিরা। ফসল খেয়ে ফেলত। ক্ষতি হত মানুষের।

তারপর?

মানুষেরা চিন্তা করল, কিছু একটা করতে হবে।

কি করল?

শেরপারা এক ধরনের পানীয় খায়। এর নাম চুয়াং। এটা খেলে মানুষের শরীর গরম হয়ে যায়। মনের ভেতর ফুর্তি আসে। বেশি ফুর্তিতে মানুষ একে অন্যের সাথে মারামারিও লাগিয়ে দেয়।

চুয়াং ভাল না।

ঠিক, চুয়াং ভাল না। মানুষেরা বুদ্ধি করল, এই খারাপ পানীয়টাকে কাজে লাগাতে হবে। এক দিন সকালে অনেকগুলো পাত্র ভর্তি করে চুয়াং নিয়ে যাওয়া হল মাঠে। মানুষেরা চুয়াং খাওয়ার ভান করল। তারপর মনে যেন খুব ফুর্তি, এমন ভান করে নাচ-গান করল।

আচ্ছা!

পাহাড়ের গুহা থেকে ইয়েতিরা কিন্তু সব দেখছিল। মানুষরা কি খাচ্ছে জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠল।

এরপর?

সন্ধ্যার সময় মানুষরা ঘরে ফিরে গেল। মাঠে রেখে গেল চুয়াংভর্তি পাত্র। তখন ইয়েতিরা নেমে এল নিচে। চুয়াং খেতে শুরু করল। বুঝতেই পারছ, এরপর কি ঘটল?

হু!

ইয়েতিরা নাচতে লাগল। গলা ছেড়ে গান গাওয়ার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ পর কারণে-অকারণে ঝগড়া লেগে গেল। শুরু হয়ে গেল মারামারি। হাতে-গোনা কয়েকটা ইয়েতি ছাড়া বাকি সব মারা পড়ল। বেঁচে যাওয়া ইয়েতিগুলোর আর মারামারি করার মত শক্তি ছিল না। ক্লান্ত শরীরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, মাঠে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ইয়েতিদের মরদেহ। দূর থেকে ভেসে আসছে মানুষের হাসির শব্দ। মানুষেরা আনন্দ করছে!

তখন কি হল? এই ইয়েতিরা কি মানুষকে আক্রমণ করল?

না। ইয়েতিরা মানুষকে ভয় পেতে শুরু করল। ওরা বুঝতে পেরেছে, মানুষ বুদ্ধি করে ওদের চুয়াং খাওয়ার লোভ দেখিয়েছে। ওরা মরে গেছে, হেরে গেছে স্রেফ মানুষের বুদ্ধির কাছে। মানুষের সাথে আর কোন ঝামেলায় গিয়ে এই ক'জনও মরে যেতে পারে। সেই বিপদ ওরা ডেকে আনতে চাইল না।

তাহলে?

ওরা ঠিক করল, মানুষের আশেপাশেই আর কখনো থাকবে না। অনেক অনেক উপরে উঠে যাবে। নিজেদের মত করে থাকবে। মানুষ ওদের দেখতে পাবে না। আর তাই ওরা উঠে গেল হিমালয়ের অনেক উঁচুতে, তাই না?

ঠিক তাই। এত উঁচুতে আর এত খারাপ পাহাড়ি জায়গায় মানুষ যেতে পারে না, তাই ওদের দেখতেও পায় না। মাঝে মাঝে বরফের উপর ইয়েতিদের পায়ের ছাপ কেবল দেখা যায়। মানুষের চোখের আড়ালে কখনো কখনো ওরা নেমে আসে। ওরা পুরনো শত্রু মানুষকে দেখে, কিন্তু মানুষ ওদেরকে দেখে না। দোলকার শেরপার দুই চোখ চকচক করছে। তিনি কেন যেন আমার দিকে, ঠিক আমার দিকে তাকিয়েই বললেন, ম' দেখে।

অর্থাৎ, আমি দেখেছি।

এরপর তিনি কেন যে আমার দিকে, ঠিক আমার দিকে ঝুঁকে বললেন, তুমি দেখবে?

কিভাবে? আম্মু কি এখনই আমাকে হিমালয়ের পাহাড়ে যেতে দেবেন? বড় হয়ে গেলে নিশ্চয়ই দেবেন। তখন আমি ঠিক ঠিক ইয়েতির খোঁজে বরফঢাকা পাহাড়-পর্বত চষে বেড়াব।

দোলকার তখন একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন। খুমজুং।

• পরবর্তী সংখ্যায়

নাসরীন মুস্তাফা
কথাসাহিত্যিক ও বিজ্ঞান লেখক

অনুবাদ গল্প

গোয়ালিনী

মাস্তি ভেঙ্কটেশ আয়াঙ্গার

মাঙ্গাম্মা কয়েক বছর ধরে আমাদের দই যোগান দিয়ে আসছে। আমাদের শহরে দই বেচাবিক্রি হয় নগদানগদি অর্থে। অন্য শহরে সারা মাস দই যোগান দিয়ে মাসের শেষে একবারে দাম পরিশোধ করতে হয়। প্রায় রোজই মাঙ্গাম্মা গোয়ালিনী আমাদের বাড়িতে দই দিতে আসে।

গোয়ালিনীর বাড়ি আভালুরের কাছাকাছি। আমি নামটা ভুলে গেছি। ভেঙ্কালুর কিংবা এমন ধরনের একটা নাম হবে। মাঙ্গাম্মা গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার ভাল সম্পর্ক গড়ে ওঠায় সে প্রায় রোজই শহরে আসার সময় আর শহর থেকে ফেরার সময় আমার এখানে আসে। সে বারান্দায় বসে এটা-ওটা নিয়ে কথাবার্তা বলে আর পান-সুপারি চিবোয়। মাঝেমধ্যে সে আমার কাছেও পান-সুপারি চায়। ফেরার সময় সে আমাদের বাড়িতে কিছু সময় বিশ্রাম করে গাঁয়ের পথ ধরে। আমার সময় থাকলে সে আমাকে তাদের সংসারের ঝুটঝামেলার কথা শোনায়। সে আমার সমস্যার কথাও জানতে চায়। আমি ভাবতাম, আমার সমস্যার কথা তাকে শুনিয়ে কী লাভ! আমাদের সংসার ভালভাবেই চলছে। এক সময় তার সঙ্গে আমার এক ধরনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

মাসখানেক আগে একদিন মাঙ্গাম্মা আমাদের বাড়িতে এসে রোজকার মত জিজ্ঞেস করল দই লাগবে কিনা। আমি কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমার ছোট ছেলেটি বলল, 'হ্যাঁ দই লাগবে।' কথাটা বলে সে গোয়ালিনীর কাছে গিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এখানে দিন।'

‘দেখ মা, আমি কখনও ভাল শাড়ির জন্য আবদার করিনি। অন্য মেয়েদের মত সেজেগুজে থাকতে চাইনি। মেয়েলোকটি আমার স্বামীকে কেড়ে নিয়ে গেল। আমি মনে করলাম অযথা হইচই করে কী লাভ! আমি তাকে বোঝার সুযোগ দিলাম এটা তার বাড়ি, নতুন স্ত্রীকে নিয়ে সে যে কোন সময় বাড়িতে আসতে পারে। আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি, এটা আমার দুর্ভাগ্য! মা, তোমাকে বলি, তুমি সাবধান হও। স্বামী বাড়ি এলে সুন্দর শাড়ি পরবে। পুরুষদের মন কিন্তু অস্থির। তুমি সুন্দর শাড়ি-ব্লাউজ পরে স্বামীর মনোরঞ্জন করবে।

মাঙ্গাম্মা দইয়ের হাঁড়ি থেকে জমাট দই চামচ দিয়ে কেটে তার হাতের ওপর দিয়ে বলল, ‘মাকে জলদি আসতে বল। আমার তাড়া আছে।’ মাঙ্গাম্মার কথা শুনে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমি তার কাছে গেলে সে আমাকে বলল, ‘মা, তোমার বাচ্চাটা সোনার ছেলে। তুমি যেমন ভাল তোমার ছেলেটাও তেমনই ভাল হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে মা, ভাল হয়েই বা কী হবে? এটা শুধুমাত্র বড় না হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে। এক সময় একটা মেয়ে আসবে তাকে আপন করে নেওয়ার জন্য। যে ছেলে মা বলতে অজ্ঞান ছিল সেই ছেলেই জিজ্ঞেস করবে না মা বেঁচে আছে না, মরে গেছে।’

তার কথা শুনে আমি তাকে বললাম, ‘মনে হচ্ছে তোমার কিছু একটা ঘটেছে। তোমার ছেলে কি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে?’

‘তাহলে শোন, আমার সোয়ামী আমাকে ভাসিয়ে রেখে গেছে। বোকার মত ছেলের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি ছেলের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করা বোকামি!’

‘কেন মাঙ্গাম্মা? আমি ভেবেছি, তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে সুখেই আছ।’

‘দেখ মা, আমি কখনও ভাল শাড়ির জন্য আবদার করিনি। অন্য মেয়েদের মত সেজেগুজে থাকতে চাইনি। মেয়েলোকটি আমার স্বামীকে কেড়ে নিয়ে গেল। আমি মনে করলাম অযথা হইচই করে কী লাভ! আমি তাকে বোঝার সুযোগ দিলাম এটা তার বাড়ি, নতুন স্ত্রীকে নিয়ে সে যে কোন সময় বাড়িতে আসতে পারে। আমি আমার স্বামীকে হারিয়েছি, এটা আমার দুর্ভাগ্য! মা, তোমাকে বলি, তুমি সাবধান হও। স্বামী বাড়ি এলে সুন্দর শাড়ি পরবে। পুরুষদের মন কিন্তু অস্থির। তুমি সুন্দর শাড়ি-ব্লাউজ পরে স্বামীর মনোরঞ্জন করবে। স্নো-পাউডার মেখে মাথায় ফুল গুঁজে তুমি সেজেগুজে রূপবতী হয়ে থাকবে।’

কথা শেষ করে সে আমার পরনের শাড়ির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ‘তুমি একা বাড়িতে রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকলে এ শাড়িই যথেষ্ট। সন্ধ্যায় অবশ্যই শাড়িটা বদলাবে। সুন্দর একটা শাড়ি পরবে।’

আমি হেসে উঠলাম। তার উপলব্ধিবোধটা ভাল। তার প্রতি আমার সহানুভূতি জাগল এটা ভেবে যে ভোগান্তির শিকার হওয়ার পর সে এ-সব জ্ঞান অর্জন করেছে।

‘তুমি ঠিক বলেছ, মাঙ্গাম্মা’, আমি বললাম।

‘দেখ মা, স্ত্রীর প্রতি স্বামী মনোযোগী হওয়ার চারটি উপায় আছে। কিছু কিছু লোক তোমাকে গাছপালার পাতা বা শিকড় ব্যবহার করে স্বামীকে বশে রাখার উপদেশ দেবে। তুমি তাদের সোজা শ্মশানে পাঠিয়ে দেবে। তাদের উপদেশ শুনবে না। স্বামীকে মাঝেমধ্যে ভাল ভাল খাবার খাওয়াবে, বাড়িতে ঝুটঝামেলা থাকলেও ভাল পোশাক-আশাক পরবে, হাসি হাসি মুখ করে থাকবে, একমাসে সংসারে যে-সব জিনিসপত্র লাগবে তার তালিকা তৈরি করে স্বামীকে দেবে, যখন-তখন বাজারঘাট করার জন্য স্বামীকে উত্যক্ত করবে না। পয়সাকড়ি জমাবে, স্বামী চাইলে দু’চার টাকা তা থেকে বের করে দেবে। এগুলোই সব, গাছগাছড়ার পাতা শিকড় আঁকড়ে কোন কাজ হবে না। একজন মহিলা ওইগুলো করলে তার স্বামী তার প্রতি কুকুরের মত অনুগত হয়ে থাকবে।’

‘তুমি দেখছি একজন জ্ঞানী মহিলা।’ কথাটা বলে তখনকার মত তাকে বিদায় দিতে চাইলাম।

তার দিনপনেরো পরে একদিন সকালে মাঙ্গাম্মা মনমরা অবস্থায় আমাদের এখানে এল।

‘ব্যাপার কী, মাঙ্গাম্মা?’ আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

‘ভাল কিছু না মা, তুমি কেন সেটা জানতে চাচ্ছ?’ সে তার শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে বলল, ‘আমি বুঝতে পারি না, কেন কেউই আমাকে দেখতে পারে না!’

‘কী হয়েছে? তোমার ছেলে কি তোমায় কিছু বলেছে?’

‘অনেক কথা মা, আমি আমার ছোট নাতিটার কথা তোমাকে বলেছিলাম। সে কিছু একটা করেছিল, ফলে তার মা তাকে বেদম মারধর করছিল। আমি সহ্য করতে না পেরে ওর মাকে বলেছিলাম, ‘তুমি নিষ্ঠুর রাক্ষুসীর মত তাকে মারধর কর।’

সে কথা শুনে ওর মা আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করল। সে বলল, ‘নিজের ছেলেকে শাসন করার অধিকার কি আমার নেই? আমি আমার ছেলেকে জন্ম দিয়েছি যেমন তুমি তোমার ছেলেকে জন্ম দিয়েছ, না?’

আমি বললাম, ‘ভাল কথা, সে আমার ছেলের স্ত্রী, আমি শুধু তার মা। ওর স্ত্রী আমাকে যে কোন সময় গালিগালাজ করতে পারে এতে আমার কিছুই করার নেই।’

‘বেশ কথা বলেছে মা,’ আমার ছেলে বলে উঠল, ‘মোটের ওপর সে তো তার নিজের ছেলে। তুমি কেন এর মধ্যে নাক গলাচ্ছ? যদি কাউকে কিছু বলতে হয় তবে আমি এখানে আছি, আমাকে বল।’

‘তুই কি ভাবছিস্ আমি ভুল করেছি? কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক না আমি কিছু বুঝি না।’

‘তুমি কি অস্বীকার করতে পার– নিজের ছেলেকে শাসন করার অধিকার তার নেই?’

‘আমি বুঝতে পারলাম তুই তোর বউয়ের কথায় ওঠবস করিস। তোর বউ তার ছেলেকে মারধর আর আমাকে গালিগালাজ করলেও তোর কিছু যায় আসে না। আজ তোর বউ এটা করেছে, আগামীকাল তোর বউ আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতেও পারে, আর তুই যদি নিজে তা করিস তাতেও আমি অবাক হব না।’

‘ভাল কথা মা, তুমি আমাকে কী করতে বল? তুমি যদি বল তোর স্ত্রী এ ধরনের ব্যবহার করায় সে এখানে থাকতে পারবে না, তাহলে সে এখানে থাকবে না। যদিও আমি তাকে ভালবাসি, যদিও সে একজন অসহায় মহিলা...’

‘আমি অসহায় নই? কে আমাকে দেখাশোনা করে?’

‘তোমার অর্থকড়ি আছে, তোমার গরুবাছুর আছে; তুমি আমার ওপর নির্ভরশীল নও।’

‘তাহলে তুই আমাকে বলছিস, আমার নিজের ঘর নিজেকেই বানিয়ে নিতে?’

‘মা, তুমি কিভাবে ভাবতে পারলে, আমার বেটার বউ মা ও ছেলের মাঝে সুসম্পর্ক মেনে নেবে? গতকাল বাড়ি গিয়ে দেখলাম, ছেলের বউ আমার হাঁড়িপাতিল ও কড়াই-টড়াই একটা মাটির পাত্রে রেখে দিয়েছে। তার একপাশে ভাত, লবণ ও মরিচ রাখা আছে। সে আর তার স্বামী তাদের খাবার খেয়ে নিয়েছে। বউটা মাদুরে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তারা আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার অপেক্ষায় আছে। আমি তাদের বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এখন থেকে আমি নিজের ওপর ভরসা করে চলব।

‘তোমার যা ইচ্ছে। তুমি ইচ্ছে করলে আলাদা ঘর তুলে নিতে পার, আমি না বলব না। আমার অনেক ধারদেনা আছে।’

‘ভাল কথা, আমি আজ বিকেলে থেকেই তোদের থেকে আলাদা হয়ে যাব। এতে তুই ও তোর বউ সুখী হবি। এই বলে আমি দই নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি।’ মাঙ্গাম্মা কাঁদতে কাঁদতে তার দুঃখের কাহিনি শেষ করল।

আমি তাকে শান্ত করার জন্য বললাম, ‘এসব কথা ভুলে যাও মাঙ্গাম্মা। তুমি বাড়ি যাও। তাদের সঙ্গে আগের মতই বসবাস কর। এসব মানিয়ে চলতে হয়।’

পরদিন মাঙ্গাম্মা এল। তাকে আগের চেয়ে কিছুটা ভাল দেখাচ্ছিল। আমি যদিও নিশ্চিত, তার মধ্যে আগের সেই প্রাণবন্ত ভাব নেই। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে তার ছেলের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পেরেছে কি-না।

‘মা, তুমি কিভাবে ভাবতে পারলে, আমার বেটার বউ মা ও ছেলের মাঝে সুসম্পর্ক মেনে নেবে? গতকাল বাড়ি গিয়ে দেখলাম, ছেলের বউ আমার হাঁড়িপাতিল ও কড়াই-টড়াই একটা মাটির পাত্রে রেখে দিয়েছে। তার একপাশে ভাত, লবণ ও মরিচ রাখা আছে। সে আর তার স্বামী তাদের খাবার খেয়ে নিয়েছে। বউটা মাদুরে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তারা আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার অপেক্ষায় আছে। আমি তাদের বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এখন থেকে আমি নিজের ওপর ভরসা করে চলব। আমি দেখব তারা কতদূর যায়! আমি প্রত্যেকদিন বাইরে বের হওয়ার সময় বাচ্চাটিকে একটু দই খেতে দিতাম। আজ আমি বাড়ি থেকে আসবার সময় বউটা তার ছেলেকে বাইরে নিয়ে গেল। এটা পরিষ্কার হল সে তার ছেলেকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেবে না।’

আমি অবাক হলাম এটা ভেবে যে, এ থেকে একটা তুলকালাম কাণ্ড ওদের বাড়িতে ঘটে যেতে পারে। আমি যা ভেবে ভীত হয়েছিলাম তা কিন্তু ঘটল না। দু’দিন পর মাঙ্গাম্মা আবার এল, তবে এ বিষয়ে কোন কথা বলল না। আমি ভাবলাম, মাঙ্গাম্মা আলাদাই বসবাস ও খাওয়াদাওয়া করছে। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি যে ভেলভেটের জ্যাকেট পরি তার দাম কত?

‘সেটা জানার ইচ্ছে হচ্ছে কেন, মাঙ্গাম্মা?’ আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

‘তুমি জান মা, আমি ছেলে ও নাতির জন্য কিছু অর্থ জমিয়েছিলাম। এখন দেখছি এটা ওদের জন্য জমিয়ে লাভ নেই। তাই ভাবছি নিজের জন্য একটা ভেলভেটের জ্যাকেট কিনব।’

‘সাত-আট টাকার মত দাম পড়বে।’

মাঙ্গাম্মা বাড়ি যাওয়ার পথে একটা জ্যাকেট কিনে নিয়ে গেল। পরদিন সে নতুন জ্যাকেট পরে আমাদের বাড়িতে হাজির হল।

‘দেখ তো, কেমন দেখাচ্ছে আমাকে? আমার স্বামী যখন আমার সঙ্গে ছিল, আমি কখনো একটা ভাল শাড়ি কিনিনি; এক সময় স্বামী অন্য মেয়েলোকের সঙ্গে চলে গেল। এতদিন ছেলের জন্য টাকা জমাচ্ছিলাম। তারপর কী ঘটল তাতো তুমি জান। এখন আমি ভেলভেটের জ্যাকেট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।’

তার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম।। তার ছেলে তার মনটাকে এলোমেলো করে দেওয়ায় সে এ ধরনের কথাবার্তা বলে একটা শোকাচ্ছন্ন ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। তাই তার কথায় কোন মন্তব্য করলাম না।

ভেলভেটের জ্যাকেটের গল্পের ওখানেই পরিসমাপ্তি ঘটল না। এ নিয়ে গ্রামের কিছু লোকের সঙ্গে তার ঝগড়া-ফ্যাসাদ পাকিয়ে উঠল। গ্রামের একটা ছেলে ব্যাঙ্গালোরে পড়াশোনা করে। বাড়ি এসে সে মাঙ্গাম্মাকে দেখে হাসি-ঠাট্টা শুরু করল।

‘বেশ মজা তো মাঙ্গাম্মা, কোন উৎসবানুষ্ঠান আছে নাকি! আমি বলতে চাচ্ছি, ভেলভেট জ্যাকেট তোমার গায়ে...’

মাঙ্গাম্মা তার কথায় রেগে আগুন হয়ে বলল, ‘ফাজিল ছোকরা! মুখ সামলে কথা বল! তুমি যদি জ্যাকেট পরতে পার তবে আমি পরলে দোষ কোথায়?’ উভয়ের মধ্যে গরমাগরম বাতচিৎ চলতে থাকায় ডজনখানেক লোক জড় হল। সবাই তার জ্যাকেটের জন্য অর্থব্যয়ে হাসাহাসি করতে লাগল।

পরদিন মাঙ্গাম্মা যথারীতি এ খবরটা আমাকে জানাল। মাঙ্গাম্মার কথাবার্তা বেটা বউয়ের কানে পৌঁছলে সে-ও বাজে মন্তব্য করতে পিছপা হল না। সে তার প্রতিবেশীদের কাছে বলল, ‘আমার শাশুড়ি আমার জন্য একটা ব্লাউজও কিনে আনে না, আর নিজের বেলায় কী করছে তোমরা কি দেখছ না?’

ছেলের বিয়ের সময় মাঙ্গাম্মা নতুনবউকে গলার হার, কানের দুল, হাতের বালা ও অন্যান্য গয়না দিয়েছিল। প্রতি বছরই সে বেটার বউকে কিছু না কিছু গয়না কিনে দেয়। বেটার বউ সবই ভুলে গেছে।

মাঙ্গাম্মা বেটার বউয়ের মন্তব্যে কান দেয়নি কিন্তু এক সময় সে তার ছেলের কাছে অভিযোগ না জানিয়ে থাকতে পারল না।

‘তোর বউ আমার জ্যাকেট সম্বন্ধে আজেবাজে কথা বলে বেড়াচ্ছে। সে এমনও বলছে আমি নাকি তাকে কোন উপহার দেইনি। আমি কি তাকে হার, বালা, কানের দুল দেইনি?’

ছেলে কিছু বলার আগেই তার স্ত্রী মুখঝাড়া দিয়ে উঠল, ‘আমার মনে হয় বিধবাটা কানের দুল ও বালা পরতে চায়। সে ওগুলো পরে দেখিয়ে বেড়াতে চায়।’

স্বামী বেচারা একটু বকুনির সুরে বলে ওঠে, ‘বউ, একটু কম কথা বল।’

সে মায়ের দিকে ফিরে বলল, ‘মা, এসব নিয়ে ঝগড়া অনেক হয়েছে। আমার বউকে যে-সব গয়না দিয়েছ, তুমি যদি চাও, সেগুলো ফেরত নিতে পার।’

‘তুমিই ভেবে দেখ, মা’ মাঙ্গাম্মা সেদিন এসে আমাকে বলল, ‘সে তার বউকে আমার সম্বন্ধে প্রতিবেশীদের কাছে

বদনাম রটাতে নিষেধ করল না। আমাকে গয়না ফেরত দিতে চেয়ে সে কি ঠিক কথা বলেছে? আমার জীবনটা দুঃখের মধ্য দিয়ে কেটে গেল।'

তার জন্য আমার খুবই কষ্ট হল। সে বর্তমানে বৃদ্ধা, ছেলেটাই তার একমাত্র সন্তান। শাশুড়ির প্রতি কি তার বেটার বউয়ের দয়াপরবশ হওয়া উচিত নয়? আমি বৃদ্ধার দুঃখের কথা ভেবে ব্যথিত হলাম।

কিছু সময় পরে মাঙ্গাম্মা আমার কাছে একটা অনুরোধ করল, 'মা, তুমি ভাল মানুষ। সে জন্যই তোমাকে বিশ্বাস করি। আমার কিছু অর্থকড়ি আছে। কাছে রাখলে পাঁচকান হবে। বড় বিপদের মধ্যে আছি। টাকাটা আমি তোমার কাছে রেখে যাব।'

'কী হয়েছে?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'আমাদের গ্রামে রাঙ্গাপ্পা নামে একটা লোক আছে। লোকটা জুয়াড়ি। গতকাল দই নিয়ে আসছিলাম, লোকটা আমার পিছু নিল। এক সময় সে আমাকে বলল, 'তুমি ভাল আছ মাঙ্গাম্মা!'

'মোটামুটি আছি', আমি বললাম, 'তবে তুমি তো জান আমি কেমন আছি।'

'হ্যাঁ, মাঙ্গাম্মা, আমি জানি। লোকজন তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করছে তাতে কি কেউ ভাল থাকতে পারে? ছোকরাগুলো তাদের জিবকে সংযত করতে পারছে না। জাতটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে, মাঙ্গাম্মা!'

আমি হাঁটতে লাগলাম। ভারি অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। ভেবে পাচ্ছিলাম না লোকটা কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে চলছে। আমার থলেয় কিছু টাকা ছিল। সেদিন তেমন কিছু ঘটল না। সে আমার কাছ থেকে একটু চুন চেয়ে নিয়ে নিজের পথ ধরল। আজ আবার লোকটার সঙ্গে দেখা– আগবাড়িয়ে কথা বলল, 'মাঙ্গাম্মা, আমার কিছু টাকার প্রয়োজন, তুমি আমাকে কিছু টাকা ধার দেবে? আসছে ফসলে শোধ করে দেব।'

'টাকা!' আমি বললাম, 'আমি টাকা কোথায় পাব?'

'আমরা সবই জানি, তুমি কোথায় টাকা-পয়সা পুঁতে রেখেছ মাঙ্গাম্মা? তুমি আমাকে সাহায্য কর। কিছু সুদও দেব।' কিছুক্ষণ পর সে আবারও বলল, 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি না, তুমি কেন তোমার ছেলে ও তার বউয়ের সঙ্গে একত্রে থাক না? তুমি মাঝেমধ্যে তাদের এটা-ওটা কিনে দাও, তাও আমি জানি কিন্তু এখন তো তুমি তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছ।'

'তুমি দেখ মা, যখন একজন মহিলা একা একা থাকে, তখন এ ধরনের লোকের নজর পড়ে।' মাঙ্গাম্মা তার কথা শেষ করল। আমি তাকে বললাম, 'তোমার সমস্যার কথাটা আমার স্বামীকে বলব।

পরদিন মাঙ্গাম্মা এসে বলল, 'দই মেপে দিয়ে এসে কি তোমার এখানে বসতে পারব, মা? তোমাকে টাকা গুনে নিতে হবে।'

'আমি কিন্তু এখনো আমার স্বামীর কাছে তোমার কথা বলিনি', আমি তাকে বললাম, 'অন্য কোন সময়ে...'

'আমি কিন্তু ভয়ে আছি মা। রাঙ্গাপ্পা আমাকে পথঘাটে চলতে দিচ্ছে না। আজ সকালে বাগানের কাছে সে আবার এসে হাজির। সে আমাকে দেখে বলে উঠল, 'এস বসি মাঙ্গাম্মা', সে আরো বলল, 'তোমার এত তাড়া কিসের?' আমি সেখানে বসতে বাধ্য হলাম। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, পাছে না আবার জোরাজুরি করে। অনেক কথা বলার পর সে আমার হাত চেপে ধরে বলে উঠল, 'তুমি দেখতে কী সুন্দর, মাঙ্গাম্মা!'

'মা, যখন যুবতী ছিলাম, নিজের স্বামীও আমার হাত ধরতে সাহস পায়নি। অন্য পুরুষের কথা তো আসেই না। আর এখন এটা ঘটল। আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কটুস্বরে বললাম, 'নির্বোধের মত একটা কাজ করলে রাঙ্গাপ্পা! তুমি আমার স্বামী নও, আমার হাত ধরার অধিকার তুমি কোথা থেকে পেলে?' আমি এটা মেনে নিতে পরছি না, মা।'

তার কথা শুনে বললাম, 'তুমি বড় একটা সমস্যায় পড়েছ। একথা তুমি ছেলেকে জানাচ্ছ না কেন? পেছনের কথা ভুলে গিয়ে তুমি তোমার সমস্যার কথা তাকে বল।'

'আমার বেটার বউকে আমার সম্বন্ধে গুজব ছড়ানোর সুযোগ করে দিচ্ছি, আর তার ফলে কি আমি বিপদের মুখোমুখি হচ্ছি?' মাঙ্গাম্মা কথা শেষ করে কিছু একটা ভেবে আবার বলল, 'বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে, মা। বিষয়টা তোমার স্বামীকে বললে তিনি কী বলেন তা আমাকে কাল জানাবে।'

মাঙ্গাম্মা আমাদের বাড়ি থেকে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে বলল, 'একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।'

'কী হয়েছে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বাচ্চাটার জন্য কিছু মিষ্টি কিনেছিলাম...'

আমি তার কথা বুঝতে পারলাম না সে কী বলেছে, তার নাতিকে তো তার কাছে আসতে দেওয়া হয় না। তাই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন বাচ্চা?'

'কেন আমার নাতি, তাছাড়া আর কোন বাচ্চার কথা বলব!'

'কিন্তু তুমি না বলেছিলে, তাকে তোমার কাছে আসতে দেয় না।' আমি বললাম।

'কথাটা সত্যি, তার মা নিষেধ করে। বাচ্চা কি লুকিয়ে আমার কাছে আসতে পারে না? মাকে না দেখিয়ে সে লুকিয়ে আমার কাছে আসে দুধ ও দই খেতে। দুধ, দই পেলে সে নাচতে থাকে। আজ আমি বাচ্চাটার জন্য এক ঠোঙা মিষ্টি কিনে ঝুড়ির মধ্যে রেখেছিলাম। শংকরাপুরের কাছে একটা আমগাছ থেকে একটা কাক উড়ে এসে ছোঁ মেরে মিষ্টির ঠোঙাটা নিয়ে গেল।'

'এতে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। তুমি আবার মিষ্টি কিনে নিয়ে যাও।'

'এমনটা কেন হল? এর মধ্যে কি মৃত্যুর কোন ইঙ্গিত

'মা, যখন যুবতী ছিলাম, নিজের স্বামীও আমার হাত ধরতে সাহস পায়নি। অন্য পুরুষের কথা তো আসেই না। আর এখন এটা ঘটল। আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কটুস্বরে বললাম, 'নির্বোধের মত একটা কাজ করলে রাঙ্গাপ্পা! তুমি আমার স্বামী নও, আমার হাত ধরার অধিকার তুমি কোথা থেকে পেলে?' আমি এটা মেনে নিতে পরছি না, মা।' তার কথা শুনে বললাম, 'তুমি বড় একটা সমস্যায় পড়েছ। একথা তুমি ছেলেকে জানাচ্ছ না কেন? পেছনের কথা ভুলে গিয়ে তুমি তোমার সমস্যার কথা তাকে বল।'

আছে? এমনটা কেন হল? আমার জীবনের কি কোন মূল্য নেই?'

'তুমি এ নিয়ে চিন্তা কোরো না। আর এক ঠোঙা মিষ্টি কিনে নিয়ে বাড়ি যাও, এ নিয়ে অযথা ভেব না।'

'এর মাঝে কি কোন অশুভ ইঙ্গিত আছে?'

'বোকার মত কথা বোলো না, এখন বাড়ি যাও।' আমি ভাবলাম, বাড়ি যাওয়ার পথে মহিলাটি এ সব কথা ভাবতে ভাবতে যাবে। সে তার ছেলে, ছেলের বউ আর নাতিকে পেতে চায়। তাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধাভক্তি আশা করে কিন্তু তা পাচ্ছে না। মৃত্যুচিন্তা তাকে পেয়ে বসেছে। গ্রামের লোকগুলো সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। তার মনের মধ্যে জট পাকিয়ে উঠছে।

পরদিন মাঙ্গাম্মা এসে একটা সুখবর দিল। তার নাতি তার সঙ্গে থাকার জন্য এসেছিল। আমি বুঝলাম আজ তার মনটা ভাল আছে। 'বাচ্চাটার সাহস আছে', সে বলল, 'বলেছে মায়ের কাছে ফিরে যাবে না। ওর মা ওকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভয়টয় দেখালেও সে আমার হাঁটুর মাঝে আঠার মত লেগে ছিল। তাকে মায়ের কাছে ফিরে যেতে বললেও সে আমার কথায় কান দিল না। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, মা। দশটা রাত আমি একা একা ঘুমিয়েছি। ছোট্ট বাচ্চাটা আমাকে সাহসী করে তুলেছে। আমি উপলব্ধি করছি একটা পুরুষের সুরক্ষা আমার দরকার। আমার নাতিটা আমাকে বলেছে সে আমার পাশে থাকবে। এটা ঈশ্বরই তার মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমার বেটার বউ সারারাত বকাঝকা করেছে তার ছেলের উপর কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। আমি বাইরে আসার সময় সে দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে পরে ভেতরে গেছে।'

তার কথা শুনে আমি বললাম, 'কিন্তু তার মা যদি তাকে মারধর করে?'

'না, মারধর করবে না। বাচ্চাটা যখন তার সঙ্গে থাকে তখন সে তাকে মারধর করে। আমার মনে হল ওর মা এতে খুশি। আমি কখনো লক্ষ্য করিনি আমার ছেলের বউ কত সুন্দরী। আমি তাকে দূর ছাই করে দূরে দূরে সরিয়ে রেখেছি এতদিন। আসলে মেয়েটি খুবই সুন্দরী, আর সে জন্য আমার ছেলে তার বশে থাকে। আমিও আমার ছেলেকে মানিয়ে নেব। সে কখন বাড়ি আসে আর কখন বাইরে যায় আমি কখনও লক্ষ্য করিনি। এখন থেকে আমি ঘরের দরজায় বসে থাকব আর দেখব কেন সে দেরি করে বাড়ি ফেরে আর সকাল-সকাল বেরিয়ে যায়। এতে বউটাও তার নিজের ছেলের সম্বন্ধে একটা ধারণা পাবে। যদি সে কি তার পেটের ছেলেকে ছেড়ে দেবে আমার সঙ্গে?'

মহিলাটির মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠতে দেখে ভাল লাগল। আমি অনুভব করলাম শিগগিরিই তাদের মনোমালিন্য দূর হয়ে যাবে। আর সেটাই ঘটল।

বাচ্চাটা দুটো সকাল তার মা-বাবার সঙ্গে কাটাল। তৃতীয় দিনে সে তার দিদিমার সঙ্গে শহরে যাওয়ার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠল। সমস্যা দেখা দিল দইয়ের হাঁড়ি এবং নাতিকে একসঙ্গে সামাল দেওয়া নিয়ে। সে-সময় তার ছেলে-ছেলের বউ এসে বলল, 'মা তুমি মেনে নাও, আমরাই ভুল করেছি। আমাদের ভুলের জন্যই তুমি আমাদের ওপর রেগে আছ না? প্রতিবেশীরাও আমাদের এমনটাই বলেছে।'

মাঙ্গাম্মা তাদের কথা শুনে ইতস্ততভাব দেখাল। নাতিকে তার সঙ্গে শহরে নিয়ে যাওয়া একটা সমস্যা বটে, সে ভাবল। ছেলের বউ তার শাশুড়িকে বলল, 'তুমি বুড়ো বয়সে কেন এই কড়া রোদের মধ্যে বাইরে যাবে? তুমি পরিবারের কর্ত্রী। তুমি পরিবার পরিচালনা করবে বাড়িতে বসে। আমি দই বেচতে বাইরে যাব।' মাঙ্গাম্মা তার কথায় রাজি হয়ে বলল, 'তুমি এ দায়িত্ব নিতে পার। মনে করলে সপ্তাহের দু'একদিন তুমি শহরে যেতে পার।'

একদিন মাঙ্গাম্মা আর তার ছেলের বউ একসঙ্গে আমাদের বাড়িতে এল। একজনের কোলে একটা বাচ্চা ছেলে, আরেকজনের কাছে একটা ঝুড়ি।

'মা, এই হচ্ছে আমার বউমা, মানে ছেলের বউ', মাঙ্গাম্মা বলল, 'সে তার বৃদ্ধা শাশুড়িকে কোন কাজ করতে দেবে না। আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলে, এই বয়সে এত দূর হেঁটে রোদের মধ্যে তোমার কাজ করার দরকার নেই। এখন থেকে তোমার দই আমিই পৌঁছে দেব।'

আমি তাদের সঙ্গে আলাপ করে পান-সুপারি খাইয়ে বিদায় করলাম।

এতদিন আমি মাঙ্গাম্মার কাছ থেকে একতরফাভাবে ঝগড়ার কথা শুনে এসেছি। এবার অন্য পক্ষের বক্তব্য শোনার ইচ্ছে হল। একদিন মাঙ্গাম্মার বেটার বউকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি একজন বুদ্ধিমতী মেয়ে, নানজাম্মা। তোমার শাশুড়িকে কিভাবে বশে আনলে?'

'দিদি, আমি কখনোই এমনটা করতাম না। আমি তো রাক্ষুসী নই। শাশুড়ি সব সময়ই নিজের ইচ্ছেমত চলতে চাইত। সে আমার স্বামীকে পাত্তাই দিত না। বাড়িতে সম্মান না থাকলে আমার স্বামী কী করবে? আর আমিই-বা কিভাবে একজন ভাল স্ত্রী হব। আমি সংসারটা কিভাবে চালাব? এক একবার এর প্রতিকার করতে চেয়েছি। কিন্তু আমার স্বামী তো তার ছেলে, সে তাকে লালনপালন করে বড় করে তুলেছে। আমাকে মারধর করার পরও আমি তাকে ভালবাসি। আমার শাশুড়ি এর প্রতিবাদ করে। আমার ছেলে আমার সন্তান, আমার স্বামী আমার অবলম্বন। যদি স্বামীকে একটা কথা বলার অধিকার না থাকে, যদি ছেলেকে শাসন করার ক্ষমতা না থাকে তবে আমি কিভাবে সংসার চালাব?' মাঙ্গাম্মার ছেলের বউ বলল।

তার কথা শুনে বুঝতে পারলাম এখন মাঙ্গাম্মা তার ছেলের ব্যাপারে ততটা স্পর্শকাতর নয়।

' তুমি কি এখন তোমার স্বাধীনতা পেয়েছ?' আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

'এখন তো অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে। প্রশ্নটা হচ্ছে মানিয়ে নেওয়ার। যদি আমি বিষয়টাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখি তবে শাশুড়ির অর্থকড়ি অন্যে হাতিয়ে নেবে। রাঙ্গাপ্পা নামে একটা খারাপ লোক আছে, শাশুড়ি আলাদা থাকাকালে তার অর্থকড়ি হাতিয়ে নেওয়ার তালে ছিল।' বউটা থেমে আবার বলতে শুরু করল, 'এ অবস্থায় আমিই আমার ছেলেকে বললাম, 'তুই দিদিমার কাছে যা। সে তোকে মিষ্টি দেবে। আমি বললেও তুই আমার কাছে আসবিনে। এই কৌশল অবলম্বন করে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলেছি।'

'তাহলে বাচ্চাটা নিজের ইচ্ছেয় তার দিদিমার কাছে যায়নি?'

'সে আমার কথা শুনেছে এবং সে অনুসারেই সে তার দিদিমার কাছে গেছে।'

'এ ব্যাপারে তোমার স্বামীর ভূমিকা কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, আমি তাকে কিছু বলিনি। পুরুষ মানুষ এসব ব্যাপার বুঝতে চায় না।'

আমি নিশ্চিত হলাম নানজাম্মা তার সাধারণ জ্ঞান থেকে মাঙ্গাম্মাকে নিয়ে ঝামেলা পাকাবে না। লড়াইটা চলছিল গৃহস্থালির কাজকর্ম নিয়ে। নানজাম্মার ছেলে ও তার স্বামীকে নিয়েই লড়াইটার সূত্রপাত। মা ছেলেকে হাতছাড়া করতে চায় না। পুত্রবধূটি জলের কুমিরের মত তার ছেলের পা ধরে টানছিল আর মা নৌকা থেকে ছেলের হাত ধরে টানছিল তাকে রক্ষা করার জন্যে। এই লড়াইটাই মাঙ্গাম্মার বাড়িতে অশান্তির বীজ রোপণ করেছিল। কেউ করো কাছে পরাজয় স্বীকার করতে চায় না। উভয়পক্ষের বোধোদয় হওয়ায় ভুল বোঝাবুঝির পরিসমাপ্তি ঘটল।

অনুবাদ **মনোজিৎকুমার দাস**

লেখক পরিচিতি

মাস্তি ভেঙ্কটেশ আয়াঙ্গার (১৮৯১-১৯৮৬) কন্নড় ভাষার ছোটগল্পের পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচিত। তাঁর লেখা ছোটগল্পের খ্যাতি বিস্তৃতি ঘটে উপন্যাস, কবিতা ও নাটক রচনার পরিমণ্ডলে। *সারা কথেগালু* গল্প সংকলন এবং উপন্যাস *চেনা বাসাভা নায়তো* এবং *চিকা ভিরা রাজেন্দ্র* কন্নড় সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়েও কন্নড় সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমি এবং জ্ঞানপীঠসহ বহু পুরস্কারে ভূষিত হন। কন্নড় ভাষায় লেখা তাঁর ছোটগল্পের স্বকৃত ইংরেজি ভাষান্তর 'দ্য কার্ড সেলার' গল্পের বঙ্গানুবাদ এখানে 'গোয়ালিনী' নামে পত্রস্থ হল।

নতুন

HARPIC

ALL IN 1

ট্রাই করেছেন কি?

- কঠিনতম দাগ দূর করে
- ৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংস করে
- দূর্গন্ধ দূর করে

সৌহার্দ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন-আইটিইসি) কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৮টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩-৬ মাসের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আবেদনকারীরা কর্মরত সংস্থার সুপারিশপত্রসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকায় পাঠাবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:-

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000
http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-Gi Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন:
fscom@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme for the year 2014-15. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 48 reputed Institutions across India. They are typically short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 years' relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

The applicants should forward their applications to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications. The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000
http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.

Any queries may be addressed to
fscom@hcidhaka.gov.in

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা

সালেহা চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

বাইশ.

পিয়াল বা ময়ূখের শোক সংবরণ করে স্থির হল বুবু। এ বাড়ির স্বাভাবিকতা টোল খেয়ে আবার ফিরে এল। সকলের মনের মধ্যে একবিন্দু সুচমুখ কষ্টের পরেও খুব ধীরে রেডিওতে কলকাতা ধরল কাজল। গীতা দত্ত গাইছে– শচীমাতা গো/ আমি চার জনমে ছিলাম জনমদুখিনী। এরপরে সুবীর সেনের প্রপাত। কাজল নিবিষ্ট হল সেই সব গানে। রেডিওতে মাথা রেখে স্থির।

রাতে 'নিরিবিলি'র বারান্দায় বসে রীণু বিনু চুমকি ও কাজল তাকিয়ে রইল খৈ ফোঁটা আকাশে। কাজল দূরের একটি তারার পানে আঙুল দেখিয়ে বলে ওই যে ছোটমত তারা– ওটাই পিয়াল। ওরা তিনজন বলল– পিয়াল তুমি কেমন আছ? বাতাস শর শর করে কি উত্তর দিল কে জানে। ওরা বসল আরো ঘন হয়ে। চুমকি 'আমার ভাইকে এনে দাও' বলতে বলতে ঘুমিয়ে গেছে।

কিছু ছোট জামা, কাঁথা, ফতুয়া, ছোট একটি বালিশ কাঠের বাক্সে রাখতে গিয়ে মার চোখ ভিজে সারা। আবারও জানা গেল– কেউ চিরতরে আকাশের তারা হয়ে গেলে এগুলো কত তুচ্ছ। যে ছিল তেরোদিন, সে চলে গেল সকলের আগে। কেন গেল? কোথায় গেল? এই ধুলোমাটির পৃথিবী কি পিয়ালের ভাল লাগেনি? তাই আল্লাহর বাগানে? মিঠুপা গভীরতর অভিনিবেশে পড়াশুনো আর বই। রেলগাড়ির মত হুড়মুড় করে পরীক্ষা ইন করবে অল্পদিনের মধ্যে। বুবু চিঠি পেলেন– রেবু চলে এস। একা হাত পুড়িয়ে আর রাঁধতে পারছি না। এর সঙ্গে মেয়েদের ও তাদের মাকে মিস করবার কথাও লেখা ছিল। রেলের জানালার পাশে বুবুর চোখ বার বার ভিজে গেল পানিতে। যে এসেছিল কেন সে সঙ্গে যেতে পারছে না শুধু এই দুঃখে নয়, যেমন করে মেয়েরা নিজ সংসারে ফিরে যেতে কাঁদে তেমনি কোন কষ্টে।

কাজলের বুকের সেই একটুখানি সুচমুখ কষ্ট তাকে আরো গভীর করে আঘাত করল। ওরা তিনজন পাখির মত কিচ কিচ করে বলে– ছোটখালা আমরা চিঠি লিখব। উত্তর দেবে তো?

অবশ্যই। কাজল জানায়।

আমার ভাই কেন সঙ্গে যাবে না? চুমকির এই প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না। কেবল সকলের চোখ ভিজে ওঠে।

নতুন নক্সিদার জামা পেয়েছে ওরা। আব্বা ওদের সঙ্গে চলেছেন পৌঁছে দিতে। শাহেদ আসতে পারেনি পড়াশুনোর কারণে। দুলাভাইও ছুটি পাননি। তারপর ট্রেন ছেড়ে দিতেই কান্নায় কেঁপে উঠল কাজল।

রেলের দোকান থেকে নানা সব খাবার কিনলেন পান্নাভাই। আজ তিনি ওদের সময় দেবেন। কাজল ও পারুলকে। টাকার কষ্ট ছিল না পান্নাভাইয়ের। এখন 'পাপিয়া আটাকলের' দেখাশোনায় পকেট ভারি।

কি হবে এত মন খারাপ করে? শুধু আসা-যাওয়া এই তো। এই বলে দার্শনিকের মত বললেন– দেখবি এইসব যাওয়া-আসা একদিন অভ্যাস হবে।

আকাশ পরিপূর্ণ রৌদ্র-আলোয়। চৈত্রের উদাস দিন।

এমন দিনে কিছু করে ফেলা যাক। কোথায় যাওয়া যায় এখন?

কোথায় আবার? বনে। দিনের আলোয় সবাই যাবে বনে।

বেতফল, চড়ুইয়ের নীল ডিমমাখা যে বন সেখানে গিয়ে বসল তিনজন। তখন শহরবাসীরা বনের বিলাসিতা করতে পারত। অখণ্ড বন। কেবল কিছু গাছ আর ঘাস মনের আনন্দে বছরের পার বছর কাটিয়ে দিত। সে নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল না। ঘর থেকে বেরুলেই বনবাস– সে দ্বাপর ও সত্যযুগের অনেক পরে কাজলের ছেলেবেলার যুগেও হত।

পান্নাভাই বলেন আজ আমরা বনবাসী হব।

তারপর পথ চলতে চলতে বলেন– আসলে স্মৃতিগুলো নিজের হৃদয়ে চুপচাপ বসে একা একা কথা কয়। রীণু বিনু চুমকির স্মৃতি জলের মত ঘুরে ঘুরে একা কথা কইবে। জীবনানন্দ আবৃত্তি করে কলেজে প্রশংসা কুড়োন পান্না। কথায় কথায় কোট করতে পারেন জীবনানন্দ।

রহস্যময়তা চিরকাল প্রলুব্ধ করেছে কাজলকে। সম্ভব হলে বনে পিকনিক। এমনি ভাবনা ছিল মনে অনেক অকল্পনীয় অসম্ভব ইচ্ছের মত। গাছ-গাছালির বিন্যাসে সিঁথির মত পথ। সে পথ চলে গেছে দূরের গ্রামে। সবুজ বিশাল বিস্তীর্ণ মাঠ পেরিয়ে। পাখিদের কিচকিচ সারাক্ষণই লেগে আছে। কারণ এ পাখিদের দেশ, প্রজাপতিদের দেশ। বনে যদি অশরীরী আত্মা থাকে তাকেও কাজল জেনে নেবে সময়মত। এমনি নানা ভাবনা মাথায়। এখানে রাতে নাকি লাল নীল আলোর নাচও দেখা যায়। এখানে অসংখ্য অজানা গুল্ম। এখানে অসংখ্য অজানা ফুল। কিছু কিছু জায়গা বেতগাছে অগম্য। টুপটাপ কিছু বেতফল পড়ে। এক অপ্রাকৃত রূপ আছে এখানে। বাতাস গাছের পাতার ভেতরে কেমন কান্নার মত আওয়াজ তোলে। প্রকৃতির অন্তর্লোকে প্রবেশ। পানাভাইয়ের বইয়ের ভাষা। প্রকৃতির অন্তর্লোকে না হলেও গাছেদের অন্তর্লোক তো বটেই। অন্তর্লোক তাও আবার প্রকৃতির? মানুষের অন্তর্লোকে কখনো যাওয়া যায় না। ভাবে কাজল। পেয়ারা গাছের ডালে উড়ন্ত পাখিদের আসা-যাওয়া দেখতে দেখতে পাখির অন্তর্লোক নিয়ে ভেবেছে অনেক। কে জানে ফুলফোটা, ফলসা পাকার ঘটনা। কে জানে ঘাসের ঘটনা। কে জানে গাছেদের নিজস্ব নিয়ম।

এখানে ফুলের গন্ধ একেবারে অন্যরকম। এদের অনেকের খবর কেউ রাখে না। মাটিতে যাদের জন্ম তাদের খবর। ফোটে আপন মনে, ঝরে আপন মনে– সূর্য ও বাতাসকে বন্ধু করে।

কাজল পান্নার হাত ধরে আছে। অন্যপাশে পারুল জড়িয়ে আছে আরেক হাত– ভয়টয় কর জয়। তিনি গানের সুরে বলেন।

ভয় আবার কি? দিনের আলোতে ভয়?

বলা তো যায় না দিনের আলোতে দেখা দেয় নাকি কোন দিনের ভূত। চারপাশের গাছে কাঁচা-পাকা বেল। করমচা। কয়েকটি কাঁচা বেল নিয়ে গেলে মা বেলশুট করবেন। আর করমচা দিয়ে মাছ ভর্তা। ফলসা গাছের নিচে খাওয়া না-খাওয়া ফলসা। একটি গাছের পাতা ছাতার মত বড় বড়। বলে কাজল– কি নাম এ গাছের? এমন বড় বড় পাতা?

শ্রীমান গাছ। আবার কি নাম? আমি মোটেই গাছবিশারদ নই। তবে এর ফলগুলো খেয়ে দেখ চিনির মত মিষ্টি। কাজল একটি মুখে পোরে। অনেকগুলো বাঁধে ওড়নায়। ওর কাঁধ পর্যন্ত চুলে বনভূমির আলো। পারুলের মাথায় ফুল। শরীরের মত মোটা খোঁপা বাঁধে পারুল। – নামটি আমার কেউ জানে না/ বকুল পারুল নয়/ বনেরই একটি ধারে চুপটি করে রয়। এই বলে গান শেখা গলা উঁচুতে তুলে পারুল গান করে।

আর অনেক ফল টল কুড়িয়ে এসে বসে মাঠে। আদিগন্ত বিস্তীর্ণ মাঠ। দিগন্ত থেকে দিগন্তে। বেতফলে হাতের যেটুকু জখম, সেটা কোন ব্যাপারই নয়। ওরা ফল ও স্টেশনের ফলাহারে জমাট পিকনিক বাধিয়ে বসে। পান্না শুয়ে আছে দু'চোখ আকাশে মেলে। কি যে ভাবছে কে জানে? কাজল বলে– আমি বলতে পারি কি ভাবছে পান্নাভাই?

পারিস? বলে ফেল?

মিঠুপা। মিঠুপার কথা। 'নিরিবিলি'তে বুকে বই রেখে যে সব ভুলে গেছে তার কথা। জামগাছের নিচেই যে ঘর এবং সেই ঘরে যে মেয়ে মিঠু তারই কথা।

হায়রে মিঠুপা আপনি যদি জানতেন পানাউল্লাহ কার ধ্যানে দিবারাত্রি মগ্ন। পারুল বলে।

একেবারে পেকে ঝুনো নারকেল তোমরা দু'জন। পান্না বলে।

পাকা? আপনার প্রেম বুঝতে পাকতে হবে নাকি? বলে কাজল। এ শব্দটি তার পছন্দ নয়।

পান্নাভাই সব কবিতা লেখে মিঠুকে নিয়ে। মিঠু তুমি মিঠুয়া/ জীবনের জলছবি/ কবিতায় কথা কওয়া। এমনি নানা সব। পারুল ও কাজল হেসে ওঠে। কি লাভ এসব লিখে?

লাভ শব্দটাই তো অলাভের। লাভ মানে প্রেম। যার কোন মানে নেই।

তার মানে আপনি সত্যিই প্রেমে পড়েছেন তাই না? কাজল বলে।

হতে পারে। বসন্তের মত সারা কাগজে যখন গুটি গুটি মিঠু জেগে ওঠে তখনই বোঝা যায় ব্যাপার কি? বলে পারুল।

আমি সেই রোমান্টিক যে কেবল আশাতীতের প্রত্যাশায় জেগে থাকে। বলেন পান্নাভাই।

পান্না আকাশের দিকে শুয়ে তাকিয়ে আছে আকাশে। আবার দার্শনিকের মত বলে– কল্পনায় অনেকদিন থেকে মিঠু আমার সঙ্গে আছে। জীবনেও থাকবে সেটা হয়তো সম্ভব হবে না।

কাজল কি ভাবে, তারপর ধীরে বলে– একেবারেই সম্ভব নয়।

কারণ? পান্না তেমনি আকাশে তাকিয়ে আছে হাতবালিশে। ময়ূখ বা পিয়ালের মৃত্যুকে সম্বল করে হয়তো দু'একদিন মিঠুর খুব কাছে চলে আসা। পান্নাভাই এখনো জানে না কি বলতে চায় কাজল। একটা ভয়ানক কিছু বলবে বোঝা যাচ্ছে ওর ভাবভঙ্গিতে। হয়তো শক্তিশেল পড়ল কাজলের এ কথায়– পান্নাভাই পরীক্ষার পরই মিঠুপার বিয়ে। ওরা দেখে গেছে সেদিন। পছন্দ করেছে।

অনেক পরে বলে পান্না– ওরা কারা?

ওরা বরপক্ষ। বরের বড়বোন চাচা ও চাচি এসেছিলেন। পছন্দ করে মুক্তোর আংটি পরিয়ে দিয়ে গেছে?

কি করে সেই ভিলেন?

ভিলেন তো আপনি। সেই নায়ক ডাক্তার। বড়লোক। ঢাকায় নিজের বাড়ি। আর তা ছাড়া একটি সিনেমা হলও আছে বলে শুনেছি, নাম 'নিউ প্যারাডাইস'।

পান্না উঠে বসে। 'পাপিয়া আটামিল' যে 'নিউ প্যারাডাইস'র সঙ্গে পারবে না সে আর বলে দিতে হবে না। আর বাইশের আইএ ছত্রিশের ডাক্তারের সঙ্গে ডুয়েল লড়বে? ইউ মাস্ট বি জোকিং। পান্নাভাই জানে ও বোঝে। বলে– মিঠু সুখী হবে?

কেন হবে না? রোজ রোজ সিনেমা দেখতে যাবে। আর সর্দি হলেই বাড়িতে ডাক্তার মজুত থাকবে।

এই তো সব নয়?

কি জানি দুলাভাই ওকে আপনার মত কবিতা শোনাবে কিনা?

কবিতা? ঠিক তাও নয়। আচ্ছা সে সব থাক। এই বলে আবার সেই ঘাসের মাঠ ও হাতের বালিশ। তারপর নিঃশব্দ। –চল আমরা হেঁটে আসি। এই বলে পারুল ও কাজল হাঁটতে চলে যায়। খানিকদূরে গিয়ে বলে পারুল– বেশ হয়েছে। না ভেবে প্রেম করা।

এমন করে বলছিস কেন? প্রেমই তো করেছে, খারাপ কিছুতো নয়।

বোকা গাধা। পারুল আবার গজ গজ করে।

আমি ও তো ভালবাসি পান্নাভাইকে। তার মানে আমি কি বোকা গাধা?

তুই দিবাস্বপ্নের নায়িকা। বলে হেসে ওঠে পারুল। তারপর বলে– সত্যি নাকি?

আমি কিন্তু বলেছি ভালবাসা প্রেম নয়।

পার্থক্য কি?

প্রেম জাত বসন্ত। আর ভালবাসা বসন্ত নিরোধের টিকা।

এই বলে দু'জনে খিল খিল করে হেসে ওঠে। দেখলি কেমন পঞ্চাশ মিলিগ্রামের টিকা দিয়ে দিলাম। এরপরেও জাত বসন্ত যদি ধরে আমার কোন দোষ নেই। বলে আবার দু'জনে হাসে।

জানিস কাজল আমি কোনদিন ভালবেসে বা প্রেম করে বিয়ে করব না। আমি মা-বাবার পছন্দের ছেলেকে বিয়ে করব। এমন একজনকে যার 'নিউ প্যারাডাইস'র মত সিনেমা হল আছে। রোজ সিনেমা দেখলেও পয়সা লাগবে না। ভাবা যায়?

যদি তোর ডবল বয়স হয় তাহলেও?

বয়স? ও দিয়ে কি হবে।

ডবল বয়সের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে না।

বর আবার বন্ধু হয় নাকি তোর যেমন কথা।

তারপর দু'জনে ঘুরে ঘুরে আরো নানা গল্প করে। আর ফুল ফল কুড়োয়। গাছের তলা দিয়ে, ঘাসের মধ্যে দিয়ে, চোরকাঁটা বেছে পথ হাঁটে। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর অনেক রোদ বাতাসে ফুসফুসকে শক্ত করে ফিরে আসে পান্নার কাছে। পান্না তখন ঘুমে বিভোর। এত বড় শক্তিশেলের পরেও এমন ঘুম। বোধকরি জ্ঞানই নেই এখন।

বেচারা ঘুমিয়ে আছে? বলে পারুল।

বেচারা! বলে কাজল।

এই বেচারার জন্য তোদের দরদ অনেক মনে হচ্ছে। এই বলে পান্না উঠে বসে। – পানাউল্লাহ এবার তুমি পড়াশুনায় ইস্তফা দিয়া মন লাগাইয়া আব্বাজানের বাকি ব্যবসা দেখতে পার। কেবল 'পাপিয়া আটামিল' নয়। 'আনোয়ারা তেলের কল' কিংবা 'পারুল গ্রোসারি'– সবকিছু। মিঠু আর রাজেন্দ্র কলেজে বিএ পড়বে না। ও পড়লে ইডেনে পড়বে হয়তো। তুমি একা একা বিএ পড়ে সুখ পাবে?

আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে নাই বা ভাবলি। বলে পান্না।

তারপর ঠিক করে–অনেক হয়েছে এবার বাড়ির দিকে। চলতে চলতে কাঠালিচাঁপার একটি ফুলশুদ্ধ ডাল কাজলকে দিয়ে বলে– মিঠুকে দিস।

এখনো ফুল দিচ্ছ? বলে পারুল।

কি দেব তাহলে কাঁটা?

অশ্রু দিন। বলে কাজল।

তারপর যে যার বাড়ির দিকে।

বাড়িতে ঢুকতেই

মিঠুপার খপ্পরে। – দিগ্বিজয় করে ফিরলি মনে হয়। পাজামা ভর্তি চোরকাটা। শরীরে ও চুলে দুপুরের রোদ। বলল– মা তোকে আজ আস্ত রাখবেন না।

তুই আছিস কি করতে। এই বলে পান্নার সেই ফুলভরা কাঁঠালিচাপা ভিজিয়ে দিল পানিতে। জানালার ফুলদানিতে। মিঠু তাকিয়ে আছে।– তুমি আছ কি করতে এত বড় ভরসার পরে কি করবে মিঠু। ভেবে পায় না।

এ ফুলের ডাল তোমার। একজন উপহার দিয়েছেন।

মিঠু প্রশ্ন করল না কে সেই একজন।

তেইশ.

এত সময় ধরে টই টই মার পছন্দ নয়। এবং এই অপছন্দের শাস্তি থেকে যিনি বাঁচাতে পারেন তার নাম মিঠুপা।

হলদে শাড়িতে হলুদ পাখি বসে আছেন জানালার ধারে। শাড়িটার চওড়া একটি লাল রেশমের পাড় আছে। ঘরে ঢুকে এমনি কোন দৃশ্যই চোখে পড়ে ওর। সারা বাড়ির কিচকিচ, কলকাকলি, চিৎকার, কান্না, হাসি এখন কিছুই নেই। সব ব্যাক টু নরমাল। হঠাৎ এই স্তব্ধতা খারাপ লাগে। মেনে নিতে সময় এবং মনে নিতে ব্যথা। এমনি ব্যথা ব্যথা সময়ে কাজল এসে দাঁড়ায় মিঠুপার পাশে।

এতক্ষণ ছিলি কোথায়? আবার সেই প্রশ্ন।

মাঠে। বনে। স্টেশনে। আমি পান্না ও পারুল। কাজল বলে।

মা তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কাজল ফুলশুদ্ধ সেই কাঁঠালিচাপা ভিজিয়ে দেয় পানিতে। বলে– পান্না তোমাকে দিয়েছে। মিঠুপা আমি ওকে বলেছি তোর বিয়ের কথা।

তারপরেও–

ও তোমাকে বিয়ে করতে পারবে এ আশায় দেয়নি। এমনি–

থাক থাক। আরক্তমুখে বলে মিঠুপা। তুই মাঝে মাঝে বড় বাজে কথা বলিস।

আর তুই মাঝে মাঝে এমন করে কথা বলিস যেন বিয়ে করবার সম্ভাবনা না থাকলে কেউ কারো সঙ্গে কথা বলবে না।

মিঠুপা স্থির চোখে ওকে দেখছে। মার হাত থেকে বাঁচানোর ইচ্ছে বোধহয় যেতে বসেছে। কাজল অশনিসংকেতে মিঠুপার হাত চেপে ধরে। বলে– বল কতগুলো ট্রানশ্লেসন করব। আর কতগুলো অংক।

মিঠুপা তখনো নিশ্চুপ। কাজল ওর হাতের কাচের চুড়ি বাজিয়ে দেয় রিন রিন। বলে– তোমাকে না একদম হলুদ পাখির মত লাগছে।

আবার দুর্লভ হাসি ফুটলো মিঠুপার ঠোঁটে। বলে– কাজল ভুলে যাস না তুই মেয়ে। গাছে উঠলেই আর ঘুড়ি ওড়ালেই ছেলে হওয়া যায় না। পই পই করে মা সে-কথা তোকে বোঝাতে চান, আমিও তাই বলি। একদিন তুই লোকের সমালোচনার বস্তু হোস এ কেউ চায় না কাজল।

কাজল কথা শুনছে। উত্তর করে না। একসময় কেবল বলে– আমি জানি। মিঠুপা আর কিছু বলে না এ ব্যাপারে। বলে– কলঘরে যা। হাত-পা ধুয়ে ক্রিম লাগিয়ে পাজামা জামা বদলে আমার কাছে আয়। মুখটাও সাবান কাচা করিস।

কাজল কলঘরে চলে গেলে সেই ডালফুলকে দেখে মিঠু। পান্নার হৃদয় কি ও জানে না! শুধু জানে এইসব ভাল লাগা-টাগার কোন ভবিষ্যৎ নেই। অতএব বেশিদূর এগোনো বিপজ্জনক। হয়তো হৃদয়ের কোথায় এই ভক্তের জন্য একধরনের মায়া। একধরনের আঁশটে গন্ধ। এখন ভাবতে শুরু করে ঢাকার সেই জনপদ যা সে আজো দেখেনি। দেখেনি সেই ডাক্তার যার কেবল নাম শুনেছে। মস্ত বাড়ি। যে বাড়িতে অনেক মানুষ। শুনেছে দোতালার প্রতিটি ঘরেই মানুষ। ডাক্তারটি সে বাড়ির বড় ছেলে। এমন বাড়িতে একটি ডাক্তার তার নববধূকে কতখানি সময় দেবে কে জানে। তারপর নববধূ যখন কেবল বউ হবে তারপর গৃহিণী তখন? কে বলবে? একটি মুক্তোর আংটিতে জানানো হয়েছে কেবল– তোমাকে আমাদের পছন্দ। আর যাইহোক এই মেয়ে নারী-স্বাধীনতা নিয়ে কখনো আন্দোলন করবে না। তবু মিঠুর যে নিজস্ব ভাললাগা মন্দলাগা তার দাম হবে কি কখনো? আব্বা গ্রামের বাড়িতে যাবেন। বিয়ের খরচ জোগাতে জমি বিক্রি করবেন। ওরা ফার্নিচার চেয়েছে। আর বর-কনের সাজ। অলংকার। মার কিছু গয়না যাবে। যেতে যেতে একটি দু'টি থাকবে হয়তো কাজলের জন্য। কিংবা সব শেষ হবে। পোস্টমাস্টার কিনতে আব্বার খরচাপাতি তেমন হয়নি। তবে ডাক্তার বিনামূল্যে পাওয়া যাবে তাই কি হয়? ননীডাক্তার বাড়িতে দু'মিনিটের জন্য এলে ভিজিট নেয়। আর একজন ডাক্তার সারাজীবনের জন্য বিনি ভিজিটে চলে আসবে? প্রশ্নই ওঠে না।

কীসব ভাবছে মিঠু। কলঘর থেকে ফিরে এল কাজল। লাক্স সাবানের গন্ধ এল নাকে। কাজলের দিকে তাকিয়ে বলে– আমার বিয়ের কথা শুনে কি বলল পান্না?

হাপরের মত মস্ত এক দীর্ঘশ্বাস। তারপর? আর কিছু না। বিবাগী হয়ে দেশত্যাগের মত কোন ভয়াবহ ঘটনা ঘটাবেন এমন আভাস দেননি।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। এবারে এই নাও ট্রানশ্লেসন আর এই নাও অংক। সবগুলো শেষ করে তারপর আবার কথা।

পড়ন্ত বিকেলের আলোতে পাউডার। মিঠুর গালেও তাই। রূপসী মিঠুকে বিকোতে আব্বা ছুটছেন জমি বিক্রি করতে। আর পান্নাকে দিলে? গয়না শাড়ি দিয়ে সাজিয়ে রথে করে নিয়ে যেত ও। কিন্তু আব্বা বা মা– ওদের কোন একজনের তো আর মাথা খারাপ হয়নি। কি করে পান্না পারবে এক ডাক্তারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে? তার মধ্যে বয়স মাত্র বাইশ। ধুৎ প্রশ্নই ওঠে না।

খাতা খুলে ডুবে যায় কাজে। বাপরে বাপ কি সব কঠিন ট্রানশ্লেসন। –যদি কাল পুকুরে সাঁতার কাটতে কাটতে ডুবে যাই তাহলে কি হবে? কাজলের ইচ্ছা করছিল লেখে– কচু বা এ্যারাম। কিন্তু এসব লেখার মানে কি হতে পারে তা ওর জানা। আর একটি ট্রানশ্লেসন দেখে হাসি পেল ওর। –আজ থেকে আমি সদাসর্বদা মেয়ে হতে চেষ্টা করব। –আই উয়িল ট্রাই টু বি এ ওম্যান ফ্রম টু ডে এভরিটাইম। একহাজার বার কেটেকুটে এটুকু হল ওর। মিঠুপা ইংরেজি শেখে আব্বার কাছ থেকে। আব্বা শিখেছেন জে সি নেসফিল্ডের কাছ থেকে। আর কাজল শেখে মিঠুপার কাছ থেকে। আর দু'জনে যখন ঠেকে, ছুটে যায় আব্বার কাছে। ঘামাচির ইংরেজি মনে করতে পারল না কাজল। সোয়েট ড্রপ নাকিরে বাবা, ভাবল ও মনে মনে। তারপর ভাবল 'কনডেন্‌শড সোয়েট র‍্যাশ।' যদিও খানিক আগে প্রিকলিহিট কিউটিকুরা পাউডার মেখেছে। এই করে সবগুলো ট্রানশ্লেসন শেষ করে অংক শুরু করে। যৌগিক নিয়ম। যদি একটি মানুষ একদিনে তিনমাইল মাটি খোঁড়ে, পঞ্চাশ জন বিশ দিনে কতখানি মাটি খুঁড়িবে? ইচ্ছা করল লেখে– তাহারা মাটি খুঁড়িবে না ঘুমাইবে। কিন্তু এসব লেখার মানে যে কি ও জানে। এরপরে আছে চৌবাচ্চা ভরার কথা আর বানরের তৈলাক্ত বাঁশে ওঠার অংক। বানরটা আর খেয়ে দেয়ে কাজ পায় না কেবল তৈলাক্ত বাঁশে উঠতে চায় আর সেই বানরের জন্য কাজলকে কেবল অংক করতে হয়। এইসব শেষ করে একেবারে ঘর্মাক্ত কলেবরে মিঠুপার সামনে হাজির। এত কঠিন কাজ ও আগে কখনো করেনি।

মিঠুপা এখন এগুলো দেখবে না। কেবল বলে– চিরুনিটা আন। ঝুঁটিটা বেঁধে ফেলি। আর শোন মা কিছু বলবে না।

কাজল আকর্ণ হাসিতে বলে– তোর ভালবাসা এখন আমার আলাদীনের প্রদীপ। মা কেন, মার বাবাও কিছু বলবে না।

মিঠুপা হাসে। কাজল বোঝে সত্যিই মা কিছু বলবে না।

চব্বিশ.

ছাদ থেকে মমতাকে দেখতে পায় কাজল। ওমা মমতা লাল টুকটুকে একখানি বাহারি শাড়ি পড়েছে। কারণ কি? আজ আবার কার্তিক বা গণেশের পুজো নাকি? নাকি মনসা বা শীতলার। দারুণ এক খোঁপায় ফুল গাঁথা। অতসীর হাত ধরে ওদের বাড়ির দিকেই আসছে। উপর থেকে মমতাকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে কাজল বলে– মম আমি আসছি।

মাঝে মাঝে মাঠ ছাড়িয়ে ওরা অনেকদূর হাঁটতে যায়। মাঝে মাঝে ওইখানে, কালভার্টে বসে জীবন, মানুষ, প্রেম ও সন্তান উৎপাদনের কারণ নিয়ে আলোচনা করে। বই কিংবা গান এমনি কোন বিষয় পেলে সময় উড়ে যায় এইসব ছাদের পাখিদের মত।

কাজল ছাদ থেকে নিচে নামে। তারপর দোর খুলে বড় রাস্তায়। মমতার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। মমতার হাত ধরে।

ব্যাডমিন্টন খেলার কথা ছিল না আজ? শাড়ি পরেছিস যে বড়?

এই অতসী তুই বাড়ি চলে যা। আমি আর কাজল একটু হেঁটে আসি। অতসী বাড়ি যেতে পেরে বেঁচে যায়। বাড়িতে ওর অনেক কাজ। অতসী চলে যেতেই বলে– কাজল তোর সঙ্গে কথা আছে।

বিকেলটা একেবারে কবিতা। আর সেই কবিতা বিকেলে মমতা হেসে বলে– কথা আছে। রহস্য ধরা আছে ওর মুখে। বিস্মিত বড় চোখে, শাড়ি ও খোঁপাতে। এ বড়ি দেওয়া, থালি মাজা মমতা নয়। এ মমতাকে কাজল চেনে না। যে বেণী ওর পিঠে দোলে, ওর হেঁটে চলার ছন্দে নাচে এখন তা বড় একটি খোঁপা। মমতাকে মনে হয় পরীর মত। তারপর হাঁটতে হাঁটতে মমতা বলে– পবিত্র পবিত্র না–

পবিত্র কি? কাজল উৎসুক চোখে তাকায়। কি করেছে পবিত্র? কাজল প্রশ্ন করে।

মমতার দুই গালে ফোটে দুই পরিচ্ছন্ন গোলাপ।

দূরে দেওদারের মত কোন গাছে আলোছায়া। থির থির করে কাঁপছে পাতা। বলে কাজল– কি করেছে রে পবিত্র মমতা।

কাল বিকেলে পবিত্র বই পাঠিয়েছিল পড়বার জন্য। আর বই খুলতেই বেরিয়ে এল একটি চিঠি। আর সাতসকালে বই ফেরত নিতে এসেছিল। এত তাড়াতাড়ি কারো পড়া হয় না জেনেও। এসেছিল আসলে বইয়ের ভেতরে যে কাগজটি ছিল তার উত্তর নিতে।

নিশ্চয়ই সারারাত জেগে তুই একটি গভীর ঘন উত্তর লিখেছিলি?

না। বলে মমতা। তোকে বলতে এই কথা– উত্তরটা লিখব কিনা।

এসেই চলে গেল তাতো হয় না। কিছু বলেনি।

হাত ধরে বলেছে– উত্তর দিও। এই বলেই শরীরে আঁচল জড়াল মমতা। যেন ওর ঠাণ্ডা লাগছে।

তুই কি বললি?

কিছু না। আমি কি বলব। আমার মনে হচ্ছিল ফ্লু ধরেছে আমার। জ্বর জ্বর লাগছিল।

গোলাপি পাউডার লজ্জা ও আনন্দের। মমতাকে ভালবাসায় ধরেছে। কাজল বলে– সব কথা বুঝি মুখে বলতে হয়? চোখে চোখে কত কথা বলা যায়।

আমি মাটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

এখন নিশ্চয়ই সেই ফ্লু বেশ ভালভাবে তোকে পেয়ে বসেছে। তোকে বলতে হবে না। আমি বুঝতে পারছি।

চলতে চলতে মমতা বলে– কি যে করব?

কি আবার প্রেম! মমতা ব্যানার্জি ও পবিত্র চ্যাটার্জি অসুবিধা কি? কি যেন বলে পালটি ঘর– তাইতো ও।

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। পালটি ঘরটর নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিস?

আহা আমরা কেউ চাই না পবিত্র দেবদাস হোক। ব্যাপারটা অনেকটা দেবদাসীয়। ওরা দু'জনেই কিছুদিন আগে দেবদাস পড়ে মুখস্থ করে ফেলেছে। তোরা বাল্যবন্ধু। তারপর পেরেম।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে এসে বসে ঝিলের ধারে। আসার সময় দোকান থেকে রাংতামোড়া চকলেট কিনেছিল। সেগুলো মুখে পুরে বলে– আজই বাড়িতে গিয়ে উত্তর লিখবি।

কাজল জানে ও না বললেও মমতা উত্তর লিখবে। কাজল বলে– আসলে আমি আগেই ভেবেছিলাম ব্যাপার এমন হবে। মাঝে মাঝে পবিত্র তোকে যেভাবে দেখে। আর ব্যাডমিন্টন খেলতে খেলতে তোর দিকে তাকিয়ে ব্যাট করাই ভুলে যায়। ঝিলে ফুটে আছে মমতার মুখ। কাজলের মুখ। আজকের মুখ একেবারে অন্যরকম।

কাজল। মমতা ডাকে। চুপ করে থাকা ভেঙে যায়। –আমার মনে হয় তোকে একজন খুব ভালবাসে।

কে? কাজল বিস্মিত চোখে তাকায়।

পান্নাদা।

আমাকে না। মিঠুপাকে। তবে জেনে গেছে মিঠুপার বিয়ে।

জেনে কি করল?

কি করবে 'নির্ঝরের কবি'? কিছু না। হয়তো হৃদয়ে বিরাট এক ডেন্ট পড়েছে ওদের পুরনো গাড়ির মত। তবে তাও সেরে যাবে। কিন্তু আমি অবশ্যই ভালবাসি ওকে।

অবশ্যই? বলিস কি।

কাজল হাসে। বলে– আসলে প্রেম নয় মম ভালবাসা। এ নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। প্রেম জাতবসন্ত আর ভালবাসা টিকা। বলে কাজল হাসে।

সাংঘাতিক একটা কথা বলেছিস তো?

আমি অনেক সাংঘাতিক কথা জানি। এই বলে কাজল আর একটি টসটসে টফি গালে পোরে। তারপর আরো কিছুক্ষণ দু'জনে বসে থাকে সেই ঝিলের ধারে। সন্ধ্যা হয়, চারিদিকে শান্ত নীরবতা। কাজল বলে– মমতা বাড়ি যাবি না।

মমতার খোঁপার ফুলটি পড়ে গেছে। বলে– বাড়িতে যেতেই হবে।

বাড়িতে না গিয়ে কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে তোর?

মমতা ধীরে বলে– পবিত্রর কাছে। এখন মমতার কাছে একটিই সত্য সে পবিত্র নামের এক প্রেমময় যুবক। কাজল মমতার হাত ধরে। তারপর সন্ধ্যা কেটে ঘরে ফেরে। অন্ধকারে মমতার কপালের লাল টিপ জোনাকির মত ফুটে আছে। আর মমতার প্রেম পাতলা অন্ধকারে ওকে করেছে একজন নতুন কেউ। একেবারে আনকোরা। ঘ্রাণভরা মমতার হৃদয় একেবারে আনকোরা ওর নিজের কাছে।

পঁচিশ.

মিঠুপার বিয়ের দিন ঠিক হল। বৈশাখের পনেরো তারিখ। পাড়ার ছেলেরা হৈ হৈ করে গেট সাজাল। বাড়ি সাজাল। সেই পাড়ার ছেলেদের মধ্যে পান্নাভাই একজন। সবচেয়ে বেশি কাজ করল পবিত্র। সে আব্বাকে আশ্বাস দিয়ে বলে– আপনি চিন্তা করবেন না কাকাবাবু। আমরা বাড়ি সাজাব। গেট সাজাব। আপ্যায়ন করব। আপনি চুপচাপ ভেতর বাড়িতে গিয়ে কবিতা লিখুন।

নানা রঙ-বেরঙের কাগজে ঝলমল করছে 'নিরিবিলি'। এখনো সব রূপ খোলেনি। তবু কি সুন্দর। মঙ্গলঘট চিত্রিত হচ্ছে। অনেকগুলো মঙ্গলঘট বসবে পথের দু'পাশে। আলপনার নকশাই বা কি অপরূপ। কাজল এসে বসে। কাগজের শিকল বানাতে সাহায্য করে। স্বাগতম লেখাতেও এত শিল্প থাকে কাজল কখনো ভাবেনি। একটু বাঁকানো লেখায় কি অপরূপ লাগছে সেই স্বাগতমের সবগুলো অক্ষর।

সার্বিক তত্ত্বাবধানের মধ্যে লঞ্চ ঘাট থেকে বরযাত্রী আনা এইসব কাজের দায়িত্ব পান্নাভাইয়ের।

আর আব্বা অন্য ভাবনায় হিমশিম। মিঠুর জন্য সোনার গয়না, জামাইয়ের আচকান, পাজামা, বড় খাট, আলমারি, সোফাসেট, ড্রেসিং টেবিল। সেগুলো কিনবার টাকা সংগ্রহ। জমি গেল দু'বিঘা। মার অনন্তের একখানা ব্যয় হল এই কাজে। আর একখানা রইল। সেকি কাজলের জন্য? কে বলবে?

পান্নাভাইকে বোঝা যায় না। এই কাজে তার উৎসাহ আগের মতই। বিরহী নায়কের ভাবভঙ্গি একদম নেই। ওর ছবি আঁকার হাতের কুশলী পরিচয় পাওয়া গেল এই সব কাজে যখন তিনি পবিত্রকে নানা সব উপদেশ দেন।

জানালার পাশে শীতলপাটি। মিঠুপা হাতে রাখি বেঁধে বসে। হলুদ গোসল শেষ হয়েছে। অন্যহাতে কাজললতা। এই সব হলুদ গোসল সারা মেয়েকে ভূতে ধরে। তাই কাজললতা। পান্নাভাই মার খোঁজে একবার এই ঘরে এসে থমকে দাঁড়ান। শীতলপাটিতে যে শীতল হয়ে বসে আছে তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে। মা ব্যস্ত অন্যত্র। মধ্য বিকেলের আলো খেলছে মিঠুপার মুখে। উজ্জ্বল হলুদ সে। সোনার মেয়ে। বড় বড় চুলগুলো মেথি সুবাসিত। ঝকঝকে কালো। এ ঘরে মা নেই।

মিঠুপা চোখ তুলে দেখে। হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে। যে দেখছে তার দিকে তাকিয়ে। এ ঘরে আলমারির কোণে কাজল কি যেন করছিল। সে কথা জানে না কেউ। বেশ একটু সময় চলে যায়। – আপনি কি কিছু বলবেন? মিঠুপা নীরবতা ভাঙে।

আমি খালাম্মার খোঁজে– মানে না তেমন কিছু বলবার নেই।

তারপর যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়ালেন– তোমার ওই ডাক্তার লোকটি ভাগ্যবান। সুখে থাকো।

এই বলে হন হন করে রওনা দেন সামনের দিকে। আপাতত মাকে খুঁজতে নয়, সোজা বাইরে।

এই পান্নাভাই চললেন কোথায়? আলমারির ওপার থেকে বেরিয়ে কাজল ছোটে পান্নাভাইয়ের পিছু পিছু। পান্নাভাই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে– কি ব্যাপার? অমন পরিত্রাহি চিৎকার কেন?

মাকে দরকার বলছিলেন। মাতো রান্নাঘরে।

এখন না। পরে কথা বলব। মাইকের ব্যাপারে কথা ছিল।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সালেহা চৌধুরী
প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

Saffola Active

Introducing new 'Saffola Active', blended edible vegetable oil. It brings you the benefits of 2 oils (80% Rice Bran & 20% Soyabean) in one. Saffola Active is more effective for heart than any other ordinary vegetable oil. And it promises you healthy heart and healthy life.

3 Triple Action

Saffola Active is enriched with **Triple Action Formula** that contains the goodness of Omega 3, Oryzanol and Vitamin E which help to reduce LDL (bad cholesterol) levels.

LOSORB™ TECHNOLOGY

Saffola Active comes with patented **LOSORB technology**. Foods cooked in Saffola Active have lower fats due to lower absorption of oils while cooking.

5 Antioxidant

Saffola Active also has the **goodness of 5 antioxidants** which keeps your heart and life healthy.

So, start using Saffola Active from today and keep your family healthy and always rejuvenized. Available in 1 litre and 5 litres jars.

marico

Healthy Heart
Healthy Life

প্রবন্ধ

নরেন্দ্রনাথের গল্প

অমর মিত্র

নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে দেখতে দেখতে আমি বড় হয়েছি। ধুতি আর খুব সম্ভবত হালকা সাদা পাঞ্জাবি পরা নরেন্দ্রনাথকে আমি দেখেছি টালা ঝিলের পাশ দিয়ে পাইকপাড়ার দিক থেকে হেঁটে আসছেন বেলগাছিয়ার দিকে, একা একা, নিজের ভিতরে ডুবে থেকে। আমি তাঁর সঙ্গে একদিন কথা বলেছিলাম তাঁর বাড়িতে গিয়ে। আমাকে গল্পলেখক বন্ধু, আমার চেয়ে বয়সে কিছুটা বড় বিমান চট্টোপাধ্যায় নিয়ে গিয়েছিলেন। বিমান খুব স্মার্ট যুবক। দুর্গাপুর স্টিলে চাকরি করতেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে তাঁর সমুখে বসে ধূমপান সহযোগে নরেনদা নরেনদা করতে লাগলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে ভালই চিনতেন। তাঁর লেখাও পড়েছিলেন মনে হয়। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম সেই আশ্চর্য মানুষটিকে। তখন তাঁর 'রস', 'শ্বেতময়ূর', 'পালঙ্ক', 'যৌথ' 'চাঁদমিঞা', 'এক পো দুধ', 'টিকিট', 'চিলেকোঠা', 'চোর', 'রানু যদি না হত', 'বিলম্বিত লয়'...এইসব গল্পের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। কত তুচ্ছ ঘটনা, কত তুচ্ছ মুহূর্ত থেকেই না তিনি গল্প বের করতে পারতেন। আর সেই গল্প হত কী অনুভূতিময়। পাঠক, আপনি 'টিকিট' গল্পটির কথা স্মরণ করুন। সেই যে ট্রামের টিকিট বাঁচানো লোকটি এসে ধরা পড়ে গেল তার বালকপুত্রের কাছে। মনে করুন সেই জার্মান সায়েব ও কিশোরী কন্যাটির অদ্ভুত এক প্রেমের গল্প, 'শ্বেতময়ূর'। আমার গল্প লেখার প্রাথমিক পাঠ ছিল নরেন্দ্রনাথের কাছে। তাঁকে পড়ে পড়ে শিখেছি অনেক কিছু।

নরেন্দ্রনাথ এবং আন্তন চেখভ্ দুই লেখক আমার আরম্ভের সময় আমাকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে গল্প বলতে হয়। নরেন্দ্রনাথের কাহিনি বয়ন এমন গভীরতাকে ছুঁয়ে যায়, যার ভিতরে জীবনের অনেক বিরল মুহূর্তকে আন্দাজ করা যায়। গল্প জীবনের এক এক টুকরো মুহূর্ত নিয়েই যে গড়ে ওঠে তা আমি নরেন্দ্রনাথ পড়ে বার বার টের পেয়েছি। বড় কাহিনি নয়, সামান্য ঘটনা তাঁর কলমে অসামান্য হয়ে উঠত। মানব জীবনের অন্তর্নিহিত বাস্তবতাকে তিনি এমনভাবে বয়ন করতেন, যে পড়তে পড়তে তা নিজের অনুভূতিতে মিশে যেত। পড়া শেষ করে চুপচাপ বসে থাকতে হত। কী অপূর্ব সেই স্তব্ধতা! কতরকম মানুষ, কতভাবে তাদের বেঁচে থাকা। তাদের নিরুপায়তাই বা কত রকমভাবে আসে।

বিমান চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বাড়ি যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর আমি আবার তাঁর মুখোমুখি হলাম আমাদের বেলগাছিয়ার ফ্ল্যাট বাড়ির দরজায়। দরজা খুলে দেখি তিনি, কী অদ্ভুত, এও কি কখনো হয়? তিনি আমার দাদার সঙ্গে গল্প করতে এসেছিলেন। সেই সময় রেডিওতে নরেন্দ্রনাথের 'শ্বেতময়ূর' গল্পটি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন দাদা। তার আগে-পরেও তাঁর অনেক গল্প রেডিওতে সেই সময়ের তরুণ নাট্যকার মনোজ মিত্র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। আমার মনে আছে শুক্রবার রাত আটটায় রেডিওর সেই নাটক আমরা সারি দিয়ে বসে শুনতাম। নরেন্দ্রনাথের গল্পের গভীর অন্তর্মুখীনতা সেই রেডিও নাটককে দিত আলাদা মাত্রা। মানুষের প্রতি কত ভালবাসা সেই গল্পে। সেই বয়সে তাঁর লেখা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল জীবনকে কীভাবে দেখতে হবে। এই নরেন্দ্রনাথ আচমকা চলে গেলেন। তখন আমি কলকাতার বাইরে চাকরি করছি।

সেই সময় রেডিওতে নরেন্দ্রনাথের 'শ্বেতময়ূর' গল্পটি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন দাদা। তার আগে-পরেও তাঁর অনেক গল্প রেডিওতে সেই সময়ের তরুণ নাট্যকার মনোজ মিত্র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। আমার মনে আছে শুক্রবার রাত আটটায় রেডিওর সেই নাটক আমরা সারি দিয়ে বসে শুনতাম। নরেন্দ্রনাথের গল্পের গভীর অন্তর্মুখীনতা সেই রেডিও নাটককে দিত আলাদা মাত্রা। মানুষের প্রতি কত ভালবাসা সেই গল্পে। সেই বয়সে তাঁর লেখা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল জীবনকে কীভাবে দেখতে হবে। এই নরেন্দ্রনাথ আচমকা চলে গেলেন। তখন আমি কলকাতার বাইরে চাকরি করছি।

আমরা যে গল্প নিয়ে গল্পহীনতার কথা বলি, তা যে কত অসার তা নরেন্দ্রনাথকে পড়লে প্রত্যয় হয়। সব জীবনের তো একটা গল্প থাকে তা আমরা ভুলে যাই কী করে? সেই গল্প কখনো বৃত্তের মত হয়েছে তাঁর লেখায়, কখনো তা কোথাও মেলেনি, পাখির মত উড়াল দিয়েছে অনন্ত আকাশে। 'চাঁদ মিঞা' নামের গল্পটির কথা মনে করি। সেই গল্প বলে লেখকের বন্ধু লেখককে। এক নিঃসন্তান মুসলমান জমিদার নশরত আলি মৃধার কথা। সন্তানের জন্য সে একের পর এক বিয়ে করে যায়। চার বিবির একজনও সন্তান দিতে পারেনি তাকে। তখন সে এক ফকিরের মেয়েকে দ্যাখে শেষবেলায় নমাজে বসা অবস্থায়। নশরত আলি সেই রাবেয়াকে শাদি করে আনে গভীর মুগ্ধতায় ডুবে। গরিব ফকিরের মেয়েকে ধন দৌলত, অলঙ্কারেও কিন্তু সুখী করতে পারে না। কন্যার বয়সী সেই বিবির মন পায় না। সে চাঁদ মিঞা নামের এক সুপুরুষ সহিসের প্রতি মুগ্ধ গোপনে। গল্পটি খুব সাধারণ এক কাহিনি হয়ে যেতে যেতে আকাশে উড়াল দেয় অন্তিমে। কী হয়েছিল নশরত আলির প্রেমের আর ভয়ানক প্রতিশোধের, জিঘাংসার? রাবেয়া তো মরেছিল। চাঁদ মিঞার হাত ধরে বৃদ্ধ নশরত আলি রাবেয়ার কবরে ফুল দিতে যেত। চাঁদ মিঞার উপর রাবেয়ার আকর্ষণ টের পেয়ে সেই সহিসকে তীব্র চাবুকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল নশরত আলি। পাতালঘরে চালান করেছিল। রাবেয়াকে তা শুনিয়েছিল। রাবেয়া তার বাবা আইনুদ্দিন ফকিরের গাছগাছড়া দিয়ে মধ্যরাতে চাঁদ মিঞাকে শুশ্রুষা করেছিল। তা টের পেয়ে রাবেয়াকে হত্যা করে নশরত আলি। এরপর কী ঘটে? দুটি বয়ান তৈরি হয়। দুটি বয়ানের যে কোন একটিকে পাঠক গ্রহণ করতে পারেন। অথবা তিনি একটি নতুন বয়ান তৈরি করতে পারেন। গভীর এক প্রেমের গল্প শুনিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। রাবেয়ার কবরে চাঁদ মিঞার হাত ধরে যেত নশরত আলি। চাঁদ মিঞার সঙ্গে তার সৌহার্দ গভীর হয়েছিল, নাকি অন্য কোন কাহিনি ছিল, তা পাঠক পড়বেন সেই গল্পে। একটি ঘটনার নানা রকম বয়ানে নরেন্দ্রনাথের আধুনিক মনের কথা আমরা ধরতে পারি। তিনি শুধুমাত্র কাহিনি কথক ছিলেন না। বাংলা গল্প তার ঐশ্বর্যের মণিমুক্তো নরেন্দ্রনাথের কাছেই পেয়েছে। আর একটা বিষয় আমার মনে হয়, বাঙালি মুসলমান তার জীবন বৈচিত্র্য নিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রর গল্পে যে ভাবে এসেছে, তা তাঁর আগে বা পরে এসেছে কই বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের লেখকদের কথা বাদ দিলে। স্বাধীনতার পর এপারের লেখকরা যেন তাঁদের চিনতেন না। সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ এপারে সেই নীরবতা ভাঙলেন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। নরেন্দ্রনাথের গল্প 'রস' তো এখন কিংবদন্তি। মোতালেব, মাজু খাতুন, ফুলবানুর সেই গল্প পড়লে ধরা যায় নরেন্দ্রনাথের দর্শন। জীবনরসে ভরপুর নরেন্দ্রনাথ নিম্নবর্গের মানুষকে চিনতেন রক্ত মাংস আর মনের গভীরে গিয়ে। দেশভাগ নিয়ে 'পালঙ্ক' গল্পটির কথা কি ভোলা যায়? নরেন্দ্রনাথর গল্প পড়লে ধরা যায় তিনি গ্রাম সমাজ, চাষবাস, চাষীবাসী মানুষ জমি মাটি... সব নিবিড়ভাবে জানতেন। 'পালঙ্ক' গল্পের মকবুল বর্গা চাষ করে না। ক্ষেত মজুরি করে প্রয়োজনে। পাটের সময় পাট কাটে, পাট ধুয়ে মেলে দেয়, ধানের সময় ধান কাটতে যায়। জমির কাজ না থাকলে ঘরামির কাজ করে। জ্বালানির জন্য অন্যের বাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার করে, কাঠ চেলা করে দেয়। একটা লোক কতরকম কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে গ্রামে তা এইভাবে জানতেন সেই 'শ্বেতময়ূর' বা 'রানু যদি না হত'র লেখক।

'রানু যদি না হত'র কথা বলি। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন অসামান্য গল্প বলিয়ে। তাঁর মত গল্প কথক আমাদের সাহিত্যে আর আসেননি। নরেন্দ্রনাথের গল্প পড়তে পড়তে মনে হয় তিনি যেন আকাশ থেকে গল্প নামিয়ে আনতেন। তিনি যেন প্রাচীন কালের গ্রামবৃদ্ধের মত শোনাতে পারতেন কতকালের পুরনো সব কাহিনি। সে কাহিনি পূর্ববঙ্গের সেই রসের কারবারি মোতালেফ মিঞা, মাজু খাতুনের হোক বা এই কলকাতা শহরের একটি কন্যা রানুর হোক।

'রানু যদি না হত' এই শহরের এক সতের বছরের মেয়ে রানুর গল্প। এই শহর মানে এই ২০১৫-র শহর তো নয়। সেই শহর আমার ছেলেবেলার। ষাটের দশক হতে পারে। পঞ্চাশের দশকও হতে পারে গত শতাব্দীর। তারপর পৃথিবী অনেকখানি পথ পার হয়েছে। পুরনো ধ্যান-ধারণা বদলে গেছে অনেক। নরেন্দ্রনাথ তাঁর চারপাশের মানুষের মুখ আঁকতেন নানা রঙে। আমি বার বার মৃদুভাষী, আত্মমগ্ন এই লেখককে দেখে আপ্লুত হয়েছি। রানুর গল্পটি এক আত্মমগ্ন মেয়ের গল্প। নিতান্ত মধ্যবিত্ত কেরানি বাবার কন্যা রানু। কলেজে পড়ে। মা থাকে প্রায়ই অসুস্থ। রানুকে সব দেখতে হয়। সে তো মা-বাবার প্রথম সন্তান। পরে আর এক বোন বুলু, দুইটি বালক ভাই। নরেন্দ্রনাথ যে নিম্নবিত্তের সংসার আঁকেন, সেই সংসারেই আমরা বড় হয়েছি। এই বয়সে তাঁর গল্প পড়তে পেলে আমার সেই কলকাতা, সেই ছোটবেলাকে দেখা যায়।

রানুর মায়ের অসুখ, জ্বর ছাড়ছে না। বুড়ো ডাক্তার বলেছে বিকেলে এসে মিকশ্চার নিয়ে যেতে। ডিসপেন্সারিতে মিকশ্চারের শিশি রেখে রানু কলেজে গেল, ফিরল সাড়ে চারটা নাগাদ সেই বুড়ো ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে। ডাক্তার বিকেলে থাকে না। থাকে যে কম্পাউন্ডার– সেও বুড়ো। এই ডিসপেন্সারি তাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূর, এর চেয়ার টেবিল থেকে সমস্ত ফারনিচার নিতান্তই পুরনো।

তিনি তাঁর গল্প লেখা নিয়ে আশ্চর্য এক কথা লিখে গেছেন, ‘জানি সংসারে অনাচার অবিচার আর অত্যাচারের অভাব নেই। প্রেমের শক্তি যেমন, প্রয়োজনবোধে ঘৃণা বিদ্বেষের শক্তিও তেমনি। বৃহত্তর প্রেম গভীরতর কল্যাণকে অবারিত করার জন্য সেই শক্তিরও প্রয়োজন আছে। শুধু আলিঙ্গন নয়, দরকার হলে আঘাত করতেও জানা চাই, আঘাত করতেও পারা চাই। সেই পৌরুষ আর বীর্যবত্তা মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে, লেখকের রচনার মধ্যে দীপ্তি এনে দেয়...।’

দেখে মনে হয় কোনরকমে টিকে আছে। কোন চেয়ারেই বসা যায় না, ছারপোকা ভর্তি। নরেন্দ্রনাথ লিখছেন,

‘শুধু ফারনিচার না, এই ডিসপেন্সারিটির সবই পুরনো। ডাক্তার পুরনো, কম্পাউন্ডার পুরনো, চাকর পুরনো। দাই বুড়ি পর্যন্ত বুড়ি থুত্থুড়ি। ওর বয়স ষাট পঁয়ষট্টির কম হবে না। এখানে যে কেন আসে তার বাবা-মা বার বার। বুড়ো ডাক্তারের বুড়ো কম্পাউন্ডার নেই। তার টেবিলে রানুর রেখে যাওয়া শিশিটি রয়েছে। রানু বসে আছে। ডিসপেন্সারিতে আছে বুড়ি দাই সারদা। সে বন্ধ ঘরে এক গরিব বউয়ের গর্ভ পরীক্ষা করছে। পাঁচটা বাজল, তারপর ঢং করে সাড়ে পাঁচ। রানু ভেবেছিল মিকশ্চারের শিশিটি নিয়ে সে যাবে তার বন্ধু হেনার বাড়ি। সেখানে হেনার মামাতো দাদা সুনীল আসবে। অপেক্ষা করবে রানুর জন্য। কিছুই হবে না। হতাশ বিরক্ত রানু যখন চলে যাবে ভাবে দাই বুড়িকে সেই কথা বলতে সে রানুর হাত ধরে ফেলে। আর একটু বস। কম্পাউন্ডার এসে যাবে। বুড়ি তার কাছে বসা গরিব সেই গর্ভবতীকে বিদায় দেয়। তার শাড়ি ব্লাউজ দেখে রানু ভাবে কী করে বেরোয় এরা এইভাবে পথে। বুড়ি দাই বলে, হবে হবে, আর ক’বছর বাদে রানুও এমন সুখ নিয়ে আসবে তার কাছে। না তার কাছেই বা কেন হাসপাতালে যাবে। দাইয়ের কাছে কে আসে এখন? রানু লজ্জা পায়। বুড়ি বলে, তার হাতেই জন্ম হয়েছিল রানুর। সে–ই খালাশ করেছিল তাকে। জানে রানু তা। বাড়িতেই শুনেছে সে কথা। কিন্তু এর পর বুড়ি যা বলে তার জন্য রানু প্রস্তুত ছিল না। বুড়ি বলছে, রানু তো জন্মাত না, শুধু মেয়ে মানুষের জান বলে আসতে পেরেছে। সে আবার কেমন কথা? রানু কৌতূহলী হয়। বুড়ি কথাটা ভাঙতে শুরু করে ধীরে ধীরে। সে সতের বছর আগে এক দুপুরে এই ডাক্তারখানায় রানুর ঠাকুরদা এল হাঁপাতে হাঁপাতে। কী হয়েছে, না তার তিন মাসের পোয়াতি বউমা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। তার বোধ হয় সব্বোনাশ হয়ে গেল। ডাক্তার আর দাই ছুটল সেই বাড়ি। দেখল সত্যি। দাই তো সব বোঝে। ডাক্তার চিকিৎসা করে বাঁচালে বউকে আর তার পেটেরটাকে। কিন্তু হল কেন অমন? আসলে কী হয়েছিল বুড়ি দাই বলে, ওষুদ খাইয়ে প্রসূতি বউয়ের ওই অবস্থা করেছিল বউয়ের স্বামী। রানুর বাবা। ডাক্তারের জেরায় সে গোপনে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, তার চাকরি নেই, বউকে সে পড়াবেও ভেবেছে, এখন সন্তান হলে খুব অসুবিধে হয়ে যাবে ভেবেছিল, সন্তানটিকে নষ্ট করতে চেয়েছিল সে।

রানু জানল সে না আসতেও পারত। তাকে মা-বাবা চায়নি সে আসুক, তবু সে এসে গেছে। রানু কেমন শূন্য হয়ে গেল। এ পৃথিবীতে তার না আসবার, না থাকবারই কথা ছিল। কিন্তু সে আছে। সন্ধেবেলায় লোকজনে ভরা শহরের পথ দিয়ে এই যে সে হেঁটে চলেছে, এই চলবার কোন কথা ছিল না। আজকের রানু যেন এই পৃথিবীর মেয়ে নয়। সে তো জন্মাতই না। এই পৃথিবীতে তার না আসবার, না থাকবার কথাই সবচেয়ে বেশি ছিল। এই যে সন্ধেবেলায় এমন আলোয় ভরা লোকজন ভরা শহরের পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে এই চলবার কোন কথা ছিল না।

প্রতিদিনের অভ্যাসে বাড়ি ফেরা রানু আজ বিরক্ত বাড়ির উপর। মায়ের কাছে গেল না অভিমান আর রাগে। তাকে চায়নি মা বাবা। এই গল্প ক্রমশ নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের দীনতার ভিতরে ঢুকে পড়ে। বাবা হেমাঙ্গ বাড়ি ফিরে রানুর কাছে খোঁজ নেয় তার কী হয়েছে যে ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে? তারপর হেমাঙ্গ বেরোয় টাকা ধারের জন্য হাতিবাগানের দিকে। মাসের শেষ যে। রানুর দুই ভাই, বাড়ির দুই বালক খাওয়া নিয়ে বায়না করে। শুধু ডাল ভাত খেতে চায় না। রানুর পরের বোন বুলু জেরবার। রানুর মা, অভাবী সংসারের অসুস্থ গৃহিণী অপারগ স্বামীর প্রতি অভিযোগ জানায় নিজের মনে, খেতে দিতে না পারলে জন্ম দেওয়া কেন? মায়ের আক্ষেপ, ভাই দুটির না মেটা ক্ষুধার বাস্তবতা রানুকে ধীরে ধীরে নিজের সত্তার কাছে ফেরায়। সে ঘরের অন্ধকার থেকে বেরোয়। তাদের শোয়ার ঘর আর রান্না ঘরের মাঝখানে একফালি উঠোন। তার উপরে তারায় তারায় ভরা আকাশ। রানু অনুভব করে, সে না এলে এই বিরাট আকাশ আর বিপুলা পৃথিবীর হয়তো কিছুই এসে যেত না। কিন্তু সে যখন কোন না কোনভাবে একবার এসে পড়েছে, তখন এর চেয়ে বড় কথা আর কী হতে পারে। এই গল্প ফিরে ফিরে পড়ি। কত আধুনিক তিনি তাঁর ভাবনায়। জীবন দর্শনে পরিপূর্ণ তাঁর গল্প। তিনি গল্প বলিয়ে ছিলেন, কিন্তু তথাকথিত কাহিনি কথক ছিলেন না তো। তাই ‘যৌথ’র মত গল্প লেখেন তিনি সেই কতকাল আগে। সেই গল্পে একটি নারী আর দুই পুরুষ। মল্লিকার যে মূর্তি কাঠ খোদাই করতে করতে মারা যায় তার পঙ্গু দেওর, স্বরূপ, সেই মূর্তিকে সম্পূর্ণ করতে শুরু করে তার স্বামী অনুরূপ। কী অপূর্ব সেই গল্প। আবার ‘চোর’ গল্পে কম আয়ের স্বামী অমূল্য মাঝে মধ্যেই এটাওটা হাত সাফাই করে নিয়ে আসে বউয়ের জন্য। সাবান, সেন্ট, পাউডার। সে একটি পাকা চোর। যে দোকানে কাজ করে সেই দোকানেরই চুরি করে। তাতে তার বউ রেণুর মন খারাপ হয়। সে বার বার অমূল্যকে নিবৃত্ত করতে চায়। অমূল্য উলটে বলে যদি রেণু পারে প্রতিবেশীর ঘর থেকে এটা ওটা সরিয়ে আনতে তাহলে তারা সেটা বিক্রি করে বম্বে সিনেমা দেখতে পারে। রেণু প্রত্যাখান করে বার বার। তারপর একদিন অমূল্যর কাজ যায়। তখন রেণুকে গোপনে সেই কাজই করতে হয়। সে একটি ঘড়ি সরিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু তা জানার পর অমূল্যর চোখে রেণুর স্নিগ্ধ রূপটি নষ্ট মনে হয়। বিচিত্র এক মনোজগতের গল্প শুনিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ। আসলে তিনি যে কত রকম গল্প লিখেছেন তাঁর ইয়ত্তা নেই। কত রকম মানুষ, কত রকম পেশা আর কত বিচিত্র অনুভূতির জগৎ যে তাদের তা নরেন্দ্রনাথকে পড়লে ধরা যায়।

তিনি তাঁর গল্প লেখা নিয়ে আশ্চর্য এক কথা লিখে গেছেন, ‘জানি সংসারে অনাচার অবিচার আর অত্যাচারের অভাব নেই। প্রেমের শক্তি যেমন, প্রয়োজনবোধে ঘৃণা বিদ্বেষের শক্তিও তেমনি। বৃহত্তর প্রেম গভীরতর কল্যাণকে অবারিত করার জন্য সেই শক্তিরও প্রয়োজন আছে। শুধু আলিঙ্গন নয়, দরকার হলে আঘাত করতেও জানা চাই, আঘাত করতেও পারা চাই। সেই পৌরুষ আর বীর্যবত্তা মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে, লেখকের রচনার মধ্যে দীপ্তি এনে দেয়...।’ নরেন্দ্রনাথের গল্প সেই বীর্যবত্তায় পরিপূর্ণ। আর দীপ্তিমান। সমস্ত জীবন তিনি ভালবাসার গল্পই লিখেছেন। তাঁকে প্রণাম।

অমর মিত্র
ভারতের কথাসাহিত্যিক

ভ্রমণ

আরাকু ভ্যালির পথে...

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

কোজাগরীর আলোয় সোনালি বালির চর জেগে উঠলে কেমন হয় সেই সৌন্দর্য, ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ঢেউয়ের ভাঙাগড়া, নোনা জলের ফোঁটায় চিকচিক করা সমুদ্র যেন মুক্তোর মালা গাঁথছে। হারিয়ে যাচ্ছে মুক্তো সেই অন্ধকারে। পূর্বঘাট পর্বতমালায় বঙ্গোপসাগরের তটভূমির বৈচিত্র্য পরখ করতে করতে কেটে গেল চারটে দিন। ভাইজ্যাগ থেকে এক সকালে ব্যাগ গুছিয়ে, ন্যাশানাল হাইওয়ে ৫ ধরে বেরিয়ে পড়া হল আরাকু ভ্যালির উদ্দেশে। গাড়ি চলতে লাগল– উত্তরের গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারালের মেঘের ছায়া পড়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য। কখনো দেখি বিস্তৃত লেক কখনো আবার পাহাড়ের গা ঘেঁষে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকার সিঁদুরে রং।

কিছুক্ষণ পর হাইওয়ে ছেড়ে সিমহাচলম মন্দিরের দিকে গাড়ি উঠতে লাগল পাকদণ্ডী পথ বেয়ে। অনেকটা উঁচুতে উঠে ভাইজ্যাগ শহরকে একঝলকে দেখে নিলাম। তারপর সিমহাচলম মন্দিরের গোপুরম পেরিয়ে গাড়ি রেখে একছুটে নরসিংহ ও বরাহলক্ষ্মী মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে আবার পথ চলা। ভিউ পয়েন্টে দাঁড়ানো হয়। সেখান থেকে ছোট্ট লেকের মধ্যে এক মন্দির দেখাল ড্রাইভার। নরসিংহ মূর্তিকে বছরে একবার ওখানে স্নান করানো হয়। সারা বছর উগ্র নরসিংহকে চন্দনচর্চিত রাখা হয় তাঁর উগ্রতা হ্রাসের জন্য। এবার আরো ওপরে ওঠার পালা। পাহাড়ের ধারে মন্দির। জাগ্রত দেবী কত্তামাতালিকে প্রণাম জানিয়ে গাড়িতে লেবু-শুকনোলঙ্কা ঝুলিয়ে চলতে হয় নিরাপত্তার জন্য।

যদিও শৈলশহর আরাকু উপত্যকার হাতছানি ট্যুরিস্টদের কাছে অনেক বেশি তবুও আমার মতে বোরা কেভসের রাজকীয়তা আরাকু ভ্যালির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ভাইজাগ থেকে ১২০ কিমি দূরে আরাকু ভ্যালিতে চলেছি আমরা, কোট্টাভালাসা-কিরাণ্ডুল রেলপথ পেরিয়ে, সদ্যস্নাত বৃষ্টিভেজা পাহাড় পেরিয়ে। আর পরপর অগুন্তি টানেল পেরোতে পেরোতে সড়ক সফর আমাদের।

বৃষ্টিস্নাত পাগাড় বুঝি এত সবুজ হয়। রহস্যময় সেই দুপুরে হলুদ উপত্যকার সোনালি আঁচলে সবুজ পাহাড়ের আত্মসমর্পণ। এই হল স্বপ্নিল আবেশের আরাকু যেখানে নীলের মাঝে অফুরান সবুজ। ড্রাইভার জানাল ঘন ডেসিডুয়াস জঙ্গলের স্লথ ভালুক থেকে শুরু করে সাপখোপের গল্প। চড়াইপথ। দু'ধারে শুধু বাঁশঝাড় আর আমগাছ। ভদ্রাচলম অবধি পূর্বঘাট পর্বতমালার বিস্তৃত জঙ্গল চলল পাহাড়ের বুনো গন্ধ আর সারে সারে বাঁদরের সঙ্গে। ঠিক যেন ছোটনাগপুরের ঘাটি এলাকা। তেরো নম্বর টানেলে পিটস্টপ নেওয়া হল। এটি ট্যাডা রেলওয়ে স্টেশন। এখানে এপিট্যুরিজমের রেসর্ট আছে। আমাদের বুকিং আরো উঁচুতে এপিট্যুরিজমের হরিথায়।

ধানচাষ হয়েছে পাহাড়ের মাথায়। এবার ঠাণ্ডা হাওয়া রোমকূপে। খতারনক বাঁকে চলল গাড়ি। লুকোনো ঝোরার তিরতির করে বয়ে চলা। তারপর এল কয়েক কোটি বছরের পুরনো বোরা কেভস। প্রাকৃতিক উপায়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরত বৃষ্টি হয়ে চলেছে চুনাপাথর বা লাইমস্টোনের স্ট্যালাগটাইটস আর স্ট্যালাগমাইটস... চলছে সেই প্রাকৃতিক ভাঙা ও গড়া। লাইমস্টোনের তৈরি জলশিলা আর জীবন্ত পাথর। আপাতত টিকিট কেটে নিয়ে একটা বেলার জন্য পিটস্টপ সেই দুর্দান্ত বোরা কেভসে।

আরাকু ভ্যালি যাবার পথে পড়ল কয়েক কোটি বছরের পুরনো গুহা। গুহার বাইরে গোস্থানী নদী কলকল করে বয়ে চলেছে। ভারতে এমন বড় গুহা আর নেই। টিকিট কেটে গাইড নিয়ে নেমে পড়া হল গুহার অভ্যন্তরে। হাতে সার্চ লাইট। এর নাম বোরা কেভস। ব্রিটিশ জিওলজিস্ট উইলিয়াম কিং ১৮০৭ সালে আবিষ্কার করেন এই বোরা কেভস। বোরা শব্দের অর্থ হল গর্ত এবং এটি সমুদ্র স্তর থেকে ৮০০-১৩০০ মিটার উঁচুতে। সেই গর্তে প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্টি হয়ে চলেছে চুনাপাথর বা লাইমস্টোনের কীর্তি। কেমিস্ট্রি বইয়ের ছবি তখন আমার চোখের সামনে। স্ট্যালাগটাইটস আর স্ট্যালাগমাইটস এর দেশ... স্বতঃস্ফূর্তভাবে অবিরত চলছে সেই প্রাকৃতিক ভাঙা ও গড়া। চুনাপাথর বা লাইমস্টোনের তৈরি সেই জলশিলা আর জীবন্ত পাথর। পাথর যেন জীবন্ত। কোথাও জলের ধারায় মস্তিষ্কের মত আকৃতি। কোথাও-বা হরপার্বতী, নাগরাজ বাসুকী। দার্শনিক মানুষের কল্পনায় কোথাও ব্যাঙের ছাতার মত পাথরের আকৃতি। আবার ঝুলন্ত স্ট্যালাগ-টাইটসের রূপ বিশালাকৃতির ভুট্টার মত। আলো ফেলে ফেলে গাইড বন্ধু দেখালেন। হঠাৎ দেখি যেন হনুমান বাচ্চা কোলে বসে হাসছে। গুহার প্রত্যন্তরে নদী বেরিয়ে গেছে। গোস্থানী নদী। কথিত আছে আদিবাসী এক মানুষের গরু গুহায় ঢুকে পড়ে ঐ নদী পথে জীবন্ত বেরিয়েছিল। কয়েকশো খাড়াই সিঁড়ি ভেঙে গুহার সর্বোচ্চ শিখরে উঠলাম। শিবপুজো হচ্ছে। শিবলিঙ্গের মাথায় ওপর থেকে জল পড়ছে টপটপ। ট্যুরিস্ট সেখানে বেশিরভাগ বাঙালি। হঠাৎ গুহার মধ্যে যেন আদিবাসী মেয়ের নূপুরের শিঞ্জিনী শোনা গেল। পরে টর্চ ফেলে দেখা গেল গুহার দেয়ালে সমবেত ঐকতান। চামচিকের কলকাকলি। অন্ধকারে মনে হয় বেশ বেঁচে-বর্তে আছে তারা, সুখে সংসার করছে।

এবার বাইরে এসে ডাব খাওয়া তারপর আবার চলা আরাকু ভ্যালির দিকে। নাকে এল টাটকা কফির গন্ধ। পথের দু'ধারে স্থানীয় মানুষ কফিবিনস, কফি পাউডার, মশলাপাতি নিয়ে বসেছে। পাহাড়ের ধারে কফিচাষ হয়েছে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। আধো-আলোছায়াতে ঘন সবুজ আর কচি সবুজের প্রগাঢ় চুম্বন যেন। এবার সমতল। ভ্যালি এল বুঝি।

মৌসুমীবায়ু প্রত্যাবর্তনের পর আগস্ট থেকে মার্চ অবধি আরাকু ভ্যালি যাবার আদর্শ সময়। ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রিতেও নেমে যায়। আদিম উপজাতির আবাসস্থল এই আরাকু ভ্যালির আরেক আকর্ষণ হল তাদের সাবেকী টিমসা নৃত্য। তারা বিভিন্ন হোটেলে যা পরিবেশন করে পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতা বনবাসের সময় এই গুহায় বাস করেছিলেন এবং এই বোরা কেভসের পার্শ্ববর্তী জঙ্গল কিষ্কিন্ধ্যার জঙ্গলের অন্তর্গত। অনন্তগিরি রেঞ্জের সর্বোচ্চ ভিউপয়েন্ট গলাইকোন্ডালুতে গাড়ি থেকে নেমে ছবি নেওয়া হল। এখানে বিকেল বিকেল বেরিয়ে পদ্মাপুরম বোটানিকাল গার্ডেন, ট্রাইবাল মিউজিয়াম দেখে এসে আরাকু কফি হাউসে বসে টাটকা ইথিওপিয়ান কফির গন্ধ নিতে নিতে জামিয়ে আড্ডা দেওয়াটাও মন্দ নয়। কফির ওম সেই হালকা ঠাণ্ডায় জমিয়ে দিতে পারে সন্ধ্যেটাকে। কফি আর কোকো দিয়ে বানানো একটা গরম পানীয়। কি অপূর্ব সেই ক্লান্তির মুহূর্তে! এসে অবধি হোটেলের তেলেগু বৌ আপ্পালামা পিছু ছাড়ে না। আমাদের যাওয়ামাত্রই সে তেলেগু ভাষায় হাত-পা নেড়ে জানিয়ে দিল আরাকু ভ্যালির স্পেশ্যাল ট্রাইবাল ডিশ বাঁশমুরগি, সে বানিয়ে আনতে পারে, বলল নির্ধারিত সময়ে রুম সার্ভিসে সার্ভ করবে। বাঁশের মধ্যে ম্যারিনেটেড চিকেন টুকরো রেখে, বাঁশের মুখ বাঁশ পাতা দিয়ে সিল করে সবশুদ্ধ ঘণ্টাখানেক কয়লার আঁচে রান্না হবে মাংসটি। বাঁশ-মুরগি খেতে হলে ভাল জায়গায় খাওয়া ভাল। রাস্তার এধারে-ওধারে ছড়ানো-ছেটানো ধাবা স্টাইলের বাঁশমুরগি জয়েন্ট আছে তবে তা নিরাপদ কিনা জানি না। কাঁচা বাঁশে মুরগি রান্না হলে বাঁশগাছের মধ্যেকার ক্ষতিকর পোকার লার্ভাটিও পেটে চলে গেলে বিপত্তির আশংকা। তাই পাকা বাঁশে রান্নাটি হোল কিনা মাথায় রাখবেন। স্যালাড সহযোগে গরম গরম খেতে মন্দ লাগল না। আমি নাম দিলাম বংশমোরগ। বাঁশমুরগি বা বংশমোরগ যাইহোক বেশ মশলাদার অথচ সামান্য তেলে রান্নাটি একট ট্রাইবাল সিগনেচার ডিশ বোঝা গেল। দুটো বাচ্চা নিয়ে বিধবা আপ্পালামার এন্টারপ্রেনারশিপ দেখে ভালই লাগল। সে রাতে বিয়ার ও বাম্বু চিকেন জমে ক্ষীর।

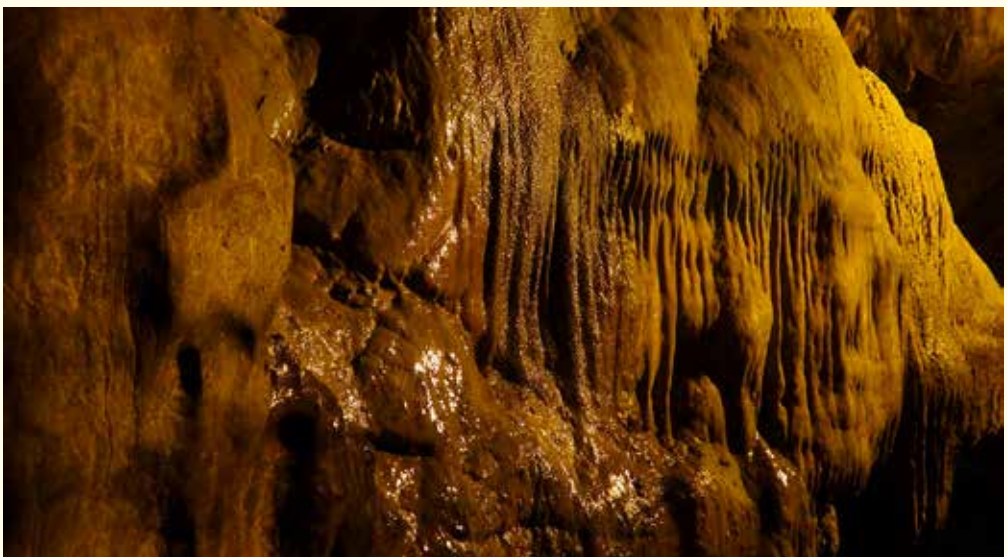

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
ভারতের লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

সলিল চৌধুরী
কালজয়ী সুর-নির্মাতা

এমিলি জামান

বিরল সুর-প্রতিভা সলিল চৌধুরীর জন্ম ১৯২৩ সনের ১৯ নভেম্বর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার হরিনাভি গ্রামে। পিতার পেশার সূত্রে চা-বাগানের ছায়াঢাকা পাখিডাকা নান্দনিক আবহে বেড়ে উঠেছিলেন। অসমের চা-বাগানে পেশাসূত্রে সম্পৃক্ত ছিলেন এক আইরিশ চিকিৎসক। চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর তাঁর বিদায়ের দিনটিতে সলিল চৌধুরীর ডাক্তার পিতার হাতে তুলে দিয়ে গেলেন বড় একগুচ্ছ ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিকালের রেকর্ড। রেকর্ডের গান আর পাখিদের মিষ্টি শিস শৈশব থেকেই সলিলের মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়েছিল। হয়ে উঠেছিলেন ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিকালের দুর্দান্ত ফ্যান। স্বতঃস্ফূর্ত পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা অঙ্কুর সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে মহীরূহে পরিণত হল। বিশ্ববাসী উপহার পেল এক ব্যতিক্রমী সুর-স্রষ্টা।

'ম্যা তো কাবছে খাড়ি ইস্ পার
এ আঁখিয়া...
ভাস গ্যায়ি পানসি নিহাল
আজারে ... পরদেশী'

সুর যেন পাহাড়ের কান্না! কণ্ঠ-সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের সিরিন ভয়েস আর সঙ্গীত-সরস্বতীর বরপুত্র সলিল চৌধুরীর প্রাণস্পর্শী সুরসজ্জা জুড়িয়ে দেয় সহস্র কোটি সঙ্গীত-পিপাসুর কান ও মন। শ্রবণ-যন্ত্র থেকে সরাসরি হৃদযন্ত্রে পৌঁছে যায়। প্রমাণিত হয় রসোত্তীর্ণ সঙ্গীত বিদগ্ধ সুর-শিল্পীর সুদক্ষ সৃজন। তবে, সুরশিল্পী বলে থেমে গেলে ভার্সেটাইল সলিল চৌধুরীর বর্ণনায় অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। গীতিকার, গল্পকার আর নাট্যকার সলিলও উপেক্ষণীয় নন। তারুণ্যে চুটিয়ে বামপন্থী রাজনীতি করেছেন। সুর তাই তাঁর রুদ্র ও ললিতের সংকর-প্রতিফলন। হেমন্ত-কণ্ঠের 'দুরন্ত ঘূর্ণি' লতার 'আজ তবে এইটুকু থাক'-এ বদলে যায়। করতালি দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে– 'জয়তু, সলিলদা'। সঙ্গীতাঙ্গনে কাছের মানুষরা তাঁকে 'সলিলদা' নামেই ডাকতেন। তাঁর সুরারোপিত গানে কণ্ঠদান করে একাধিক শিল্পী তাঁদের সাঙ্গীতিক কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছেন। সুর-গবেষক সলিল একদা বলেছিলেন, 'আই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট আ স্টাইল, হুইচ শ্যাল ট্রানসেন্ড বর্ডারস, আ জাঁর (genre) হুইচ ইজ এমফ্যাটিক এ্যান্ড পলিশড। বাট নেভার প্রেডিক্টেবল।' সবার আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ নেয় না। কিন্তু, সলিলের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়েছে। তাঁর প্রখর সুরজ্ঞান, সজাগ স্নায়ু আর ঈর্ষণীয় সৃজনধর্মিতা তাঁকে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে। বৈচিত্র্য-প্লাবিত ভারতবর্ষে একাধিক ভাষা আর ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত। বুদ্ধিদীপ্ত ও কর্মপ্রেমী সলিল তাঁর অনুসন্ধানী সঙ্গীত-ভ্রমণে সুরের ফুল ফুটিয়েছেন একাধিক ভারতীয় ভাষার ফিল্মি ও নন-ফিল্মি গানে। বাংলা, হিন্দি, অসমিয়া, মালয়ালম, ওড়িয়া, কন্নড় সব ভাষাতেই তাঁর একাধিক শ্রোতাপ্রিয় গান রচিত হয়েছে।

সলিল ছিলেন বহুবাদ্য-বিশারদ। বাঁশি তিনি নিজে নিজেই বাজাতে শিখেছিলেন। গিটার, এস্রাজ আর পিয়ানো অসম্ভব ভাল বাজাতেন। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসে নিজেকে তিনি দ্বিতীয় মোজার্ট বলে দাবি করতেন। তাঁর ছিল দুর্দান্ত কর্মস্পৃহা। একবার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'কোনটা আমার সুনির্দিষ্ট কাজ তা আমি বলতে পারি না। দরকার বুঝে আমি সুরকার, গীতিকার, এমনকি চিত্রনাট্যকারও হই।'

কণ্ঠশিল্পীর ভয়েস-ফ্রিকোয়েন্সি বুঝে তিনি সুর নির্মাণ করতেন। ক্ল্যাসিকালের ওপর তাঁর কী পরিমাণ দখল ছিল ধনঞ্জয়ের 'ঝানানা ঝানানা বাজে' বা মান্না দে-র 'বাজেগো বীণা' শুনলেই বোঝা যায়। অনেক সময় সলিল একই সুর ভিন্ন ভিন্ন ভাষার গানে এবং ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে বসিয়ে দিয়েছেন। ইমপ্রোভাইজেশনের ওস্তাদ ছিলেন সলিল। হিন্দি ছবি *মধুমতি*র 'তড়পে চুনারিয়া'র সুর বাংলা গান 'বাঁধবে না চুল সে'-তে বসিয়ে দিয়েছেন। দু'টি গানই শ্রুতিনন্দন ও শ্রোতাপ্রিয় হয়েছে সলিলের সুদক্ষ মিউজিক কম্পোজিশনের কল্যাণে। এজাতীয় অসংখ্য নমুনা রয়েছে সলিলের কাজে। হিন্দি *মধুমতি* যতটা না কাহিনিগুণে, তার চেয়ে অনেক বেশি হিট হয়েছে সলিলের মিউজিক কম্পোজিশনের জাদুস্পর্শে। আরো একটি হিন্দি ছবি *আনন্দ*-এও কিছুটা তাই।

ফিল্মের সিচুয়েশন, গানের কথা সব দিকে লক্ষ্য রেখে সুর নির্মাণ করতেন সলিল। পাখিদের সুরেলা শিস শুনে সহধর্মিণী ও সঙ্গীতশিল্পী সবিতার গলায় বসিয়ে দিয়েছিলেন আজ অবধি শ্রোতাপ্রিয় বিশেষ একটি গান– 'বউ কথা কও বলে পাখি আর ডাকিস না।' ভারতের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীদের অধিকাংশেরই সলিলের সুরে গান করার সৌভাগ্য ঘটেছে। হেমন্ত, ধনঞ্জয়, মান্না দে, লতা, আশা, হৈমন্তী প্রমুখ সলিলের স্নেহ-ঋদ্ধ কতিপয় সফল কণ্ঠসঙ্গীত শিল্পী।

সংগ্রামী সুরের ঝাঁঝ ছড়িয়ে তৈরি করেছেন বেশ ক'টি গণসঙ্গীত। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ্য– 'রানার ছুটেছে রানার', 'বিচারপতি তোমার বিচার' ইত্যাদি। মানুষ হিসেবে সলিল ছিলেন মিশুক প্রকৃতির। প্রতিভার অহঙ্কারে আচ্ছন্ন ছিলেন না। একাধিক গীতিকার, কণ্ঠশিল্পী ও চিত্রনাট্যকার সলিলের সস্নেহ পরামর্শে নিজেদের গ্রুমিং করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন দু'বার। তাঁর প্রথমা স্ত্রী জ্যোতি আর দ্বিতীয়া সবিতা চৌধুরী। সবিতা চৌধুরী গায়িকা হিসেবে সাফল্য অর্জন করেছেন। পাঁচ সন্তানের জনক সলিল। তাঁর কন্যা অন্তরা চৌধুরী সুপরিচিত, শ্রোতাপ্রিয় গায়িকা এবং পুত্র সঞ্জয় চৌধুরী কতিপয় সফল মিউজিক কম্পোজারের অন্যতম। ৭৫টি হিন্দি, ৪০টি বাংলা এবং ২৭টি মালয়ালম ছবির সঙ্গীতকার ছিলেন সলিল। এছাড়াও সুর করেছেন মারাঠি, তামিল, তেলেগু, কন্নড়, গুজরাতি, ওড়িয়া ও অসমিয়া চলচ্চিত্রে। ১৯৯৫-এর ৫ সেপ্টেম্বর ৭১ বছর বয়সে সহস্র কোটি অনুরাগীর নয়নাশ্রু ঝরিয়ে পৃথিবীকে বিদায় জানান এই বিরল সুরস্রষ্টা।

সলিল চৌধুরীর সুরারোপিত কয়েকটি শ্রোতাপ্রিয় গান– ও সাজনা বারখা বাহার আয়ি (হিন্দি ছবি *পরখ*), না জিয়া লাগে না (হিন্দি ছবি *আনন্দ*), রানার ছুটেছে রানার, দুরন্ত ঘূর্ণি এই লেগেছে পাক, সুহানা সফর অর মওসম হাসিন (হিন্দি ছবি *মধুমতি*), আজ তবে এইটুকু থাক, বাজে গো বীণা, বাঁধবে না চুল সে।

*মধুমতি*র সঙ্গীতকার হিসেবে ১৯৫৮ সালে বেস্ট মিউজিক ডিরেক্টর শাখায় ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড পান সলিল চৌধুরী। এছাড়া, ১৯৭১ সালে বেস্ট মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কর্নাটক স্টেট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড পান কন্নড় ছবি *সমস্যা প্যাহ্লার* জন্য।

এমিলি জামান প্রতিবেদক

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

বাড়ি ৩৫, রোড ২৪, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২
বাড়ি ২৪, সড়ক ২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫

উপর থেকে নীচে

৫ নভেম্বর ২০১৫ আইজিসিসি হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় কণ্ঠসংগীত বিভাগের সংগীতসন্ধ্যা

৬ নভেম্বর ২০১৫ আমিনা আহমেদ ও গোলাম হায়দারের রবীন্দ্রসংগীত সন্ধ্যা

৭ নভেম্বর ২০১৫ অনিন্দিতা কাজীর 'রবি পরিক্রমায় নজরুল' শীর্ষক নজরুল সংগীত এবং লিলি ইসলামের রবীন্দ্রসংগীত সন্ধ্যা

১৩ নভেম্বর ২০১৫ মাসুদ আহমেদের হারানো দিনের বাংলা গানের সন্ধ্যা

১৪ নভেম্বর ২০১৫ জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা আবৃত্তি সন্ধ্যা

উপর থেকে নীচে

২০ নভেম্বর ২০১৫ 'পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বাংলা চলচ্চিত্র' শীর্ষক বক্তৃতা সন্ধ্যায় ড. রহমান চৌধুরী ও ড. এজেএম শফিউল আলম ভূঁইয়া

২১ নভেম্বর ২০১৫ ফারহানা রহমান কান্তার পরিবেশনায় রাগাশ্রয়ী বাংলা আধুনিক গান

২৮ নভেম্বর ২০১৫ মৃদুলা সমাদ্দারের নজরুল গীতি ও আধুনিক বাংলা গান পরিবেশন

১ ডিসেম্বর ২০১৫ 'বেঙ্গল ক্লাসিক্যাল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল ২০১৫'-র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পঙ্কজ সরন

৫ ডিসেম্বর ২০১৫ ডালিয়া আহমেদের আবৃত্তি সন্ধ্যা

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra December 2015

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ঢাকার ধানমন্ডিতে নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ১জানুয়ারি, ২০১৫ বৃহস্পতিবার থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকায় একটি নতুন আইভিএসি সুবিধাদানের ঘোষণা দিচ্ছে।

ঠিকানা

আইভিএসি কেন্দ্র, বাড়ি ২৪, সড়ক ২, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।
আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্র বিদ্যমান। এগুলি হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা (নতুন) ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী।
ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

০১.০১.২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে:
১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

০১.০১.২০১৫ থেকে বিশেষভাবে কার্যকর, আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

মেডিক্যাল ভিসা

আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে একটি বিশেষ মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা কাউন্টার রয়েছে। ই-টোকেন ছাড়াও আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯
০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত